অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

Economic Development and Planning

১০

ভূমিকা

মানুষ তার বহুবিধ প্রয়োজন দ্রুততম সময়ে অর্জন করতে চায় কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান অত্যন্ত সীমিত। তাই মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি, সম্পদ আহরণ এবং তুলনামূলক স্বল্প-ব্যয়ে আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও অর্জনে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। এরূপ পরিকল্পনার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়। পৃথিবীতে উন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাস প্রায় শত বছর পুরাতন হলেও বাংলাদেশে এর অভিজ্ঞতা প্রায় পাঁচ দশকের। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না পেলেও অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

এ ইউনিট থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা ও ব্যাখ্যা জানতে পারব।

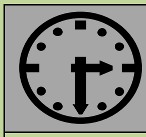 **ইউনিট সমাপ্তির সময়**	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় চার সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ : প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন
পাঠ-১০.২ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ
পাঠ-১০.৩ : স্যুম্পিটারের উন্নয়ন তত্ত্ব
পাঠ-১০.৪ : রোজেনস্টেইন রোডান এর বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্ব
পাঠ-১০.৫ : হ্যারড-ডোমার প্রবৃদ্ধি মডেল
পাঠ-১০.৬ : রস্টোর উন্নয়ন স্তর তত্ত্ব
পাঠ-১০.৭ : উদ্বৃত্ত শ্রম সংক্রান্ত লুইস মডেল
পাঠ-১০.৮ : বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির ধারা
পাঠ-১০.৯ : অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
পাঠ-১০.১০ : উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন ধারণাসমূহ
পাঠ-১০.১১ : উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ও অভিজ্ঞতা

পাঠ ১০.১ প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন
Growth and Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারবেন,
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল নির্ধারকসমূহ জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :
প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন
Growth and Development

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণাদ্বয়কে অনেকে প্রায়ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু সঠিক অর্থে এ দুটি ধারণার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও এ দুটি ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন অধ্যাপক আর্থার লুইস, অধ্যাপক পল. এ ব্যারেন-এর দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলত একই ধারণা। কিন্তু **জে.এ. সুম্‌পিটার, কিন্ডেল বার্জার এবং মিসেস হিক্‌স** প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ এ দুটি ধারণাকে পৃথক অর্থে উপস্থাপন করেন।

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি[*] (Economic Growth) ঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে বোঝায়। অর্থাৎ **অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মোট জাতীয় আয় এর বার্ষিক চলমান বৃদ্ধি বা পরিবর্তনের হারকে প্রবৃদ্ধি বলে।** প্রবৃদ্ধি শুধু জাতীয় আয় বা অর্থনীতির যেকোনো একক খাত (যেমন কৃষি, শিল্প বা সেবা) অথবা এসব খাতের উপ-খাতসমূহের পরিমাণগত পরিবর্তন (ভিত্তি বছরের সাপেক্ষে হিসাবি বছরের) প্রকাশ করে, কোনো গুণগত পরিবর্তন প্রকাশ করে না।

প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন :

অধ্যাপক জে.এ. সুম্‌পিটার-এর মতে, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একটি অব্যাহত ও ধীর প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে এগুতে থাকে। এভাবে জনসংখ্যা ও সঞ্চয় হারের সাধারণ বৃদ্ধির মাধ্যমে কোন অর্থনীতির দীর্ঘকালে ক্রমিক এবং স্থির পরিবর্তন সাধিত হলে, তাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে।"[*1]

ফিলিস ডিন (Phillis Deane)-এর মতে, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে জাতীয় আয়ের অব্যাহত বৃদ্ধির প্রক্রিয়া, যার দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

অধ্যাপক র‍্যাগান (Ragan) এবং **থমাস** (Thomas)-এর মতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে অর্থনৈতিক সামর্থ্যে দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদনের সুদীর্ঘ ব্যাপ্তি। এটি দ্বারা কোনো জাতির উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এবং সামগ্রিক যোগান রেখার নিরবচ্ছিন্ন ডানদিকে উর্ধ্বমুখী স্থানান্তর বোঝায়।[*2]

---

* GDP per capita % growth (2009-10) : বাংলাদেশ 4.4, ভারত 8.3, পাকিস্তান 2.1, গ্রীস 4.9, ইরিত্রিয়া –0.7, প্যারাগুয়ে (Paraguay) 13.3, ইথিওপিয়া 7.3, যুক্তরাষ্ট্র 2.0, যুক্তরাজ্য 0.6, কানাডা 1.8, জাপান 5.3।
সূত্র : World Development Report : 2012

*1. "Growth is a gradual and steady change in the long run which comes out by a general increase in the rate of savings and population." –J. A. Schumpeter.

*2. "Economic growth is a long-run expansion in an economy's capacity to produce goods and services. Implies a sustained rightward shifting of a nation's production possibilities curve and aggregate supply curve."

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একটি পরিমাণগত ধারণা। এটি শ্রমশক্তির প্রসার, পুঁজি, ব্যবসায় ও ভোগের বৃদ্ধিকে বোঝায় যার লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি।

অতএব বলা যায়, *কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বার্ষিক পরিবর্তনের হার বা চলমান বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে।*

প্রকারভেদ : প্রবৃদ্ধি তিনভাবে পরিচালিত হতে পারে। যথা :

(ক) জাতীয় আয়ের একই হারে বৃদ্ধি।

(খ) জাতীয় আয়ের ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি।

(গ) জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি।

সূত্র : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি $G = \frac{\Delta Q}{Q} = \frac{I}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{I}$

এখানে, G = প্রবৃদ্ধি

Q = উৎপাদনের পরিমাণ

ΔQ = উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন

I = বিনিয়োগ

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এমন এক চলমান গতিধারাকে নির্দেশ করে, যা কতগুলো শক্তির সংযোগ, যার মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ হলো জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ক্ষমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ইত্যাদির ক্রমাগত বৃদ্ধিসহ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন।

অধ্যাপক উইলিয়াম এবং **বাট্রিকের** মতে, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে এরূপ এক প্রক্রিয়া যা দ্বারা কোনো দেশের বা অঞ্চলের জনগণ প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে, অব্যাহতভাবে মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে।"*

অধ্যাপক সুমপিটার-এর মতে, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনীতির স্থিতিশীল পর্যায়ে একটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া যা পূর্ববর্তী ভারসাম্য অবস্থাকে পরিবর্তিত এবং স্থানান্তরিত করতে পারে।"

অর্থনীতিবিদ সি. ই. ব্লাক (C. E. Black)-এর মতে, "উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক সাম্য, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান, উন্নত প্রতিষ্ঠান ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে গৃহীত যুক্তিযুক্ত সমন্বিত নীতি পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জিত আধুনিকায়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হিসেবে গণ্য করা যায়।" (The Dynamics of Modernization)

মিসেস হিকস্ বলেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে একদিকে অধিক উৎপাদন এবং একই সাথে যে কৌশলগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা উৎপাদিত ও বণ্টিত হয়ে থাকে, তার পরিবর্তনও নির্দেশ করে।"

অধ্যাপক পল. এ ব্যারেন এর মতে, "সময়ের ব্যবধানে বস্তুগত সম্পদের মাথাপিছু উৎপাদনের যেকোনো বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।"

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **অধ্যাপক রস্টো (Rostow)** নিম্নোক্ত প্রবণতার কথা উল্লেখ করেন :

(ক) মৌলিক বিজ্ঞান প্রসারের প্রবণতা।

(খ) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর প্রবণতা।

---

* Economic development refers to a process whereby the people of a country or region come to utilise the resources available to bring about sustained increase in per-capita production of goods and services.
–Williams and Batrick

(গ) বৈষয়িক উন্নতি অর্জনের প্রবণতা।

(ঘ) উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনের পর বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রবণতা।

(ঙ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা। (বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা।)

(চ) মূলধনসামগ্রীর মজুদ বৃদ্ধির প্রবণতা।

অতএব, উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনো দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, সরকারি কর্মকাণ্ড ও নীতিসমূহের সমন্বিত বাস্তবায়ন প্রভৃতি নির্দেশ করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির পার্থক্য

Difference between Economic Growth & Development

উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি এক অর্থে ব্যবহার করা যায় না। এদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে। **অর্থনীতিবিদ কিন্ডেল বার্জার** (Kindle Berger)-এর মতে, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে অধিক উৎপাদনকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার উর্ধ্বমুখী পরিবর্তনকে বোঝায়।" আধুনিক **অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মিল্টন ফ্রিডম্যান** (Milton Friedman) এর মতে, " ... উন্নয়ন হলো নতুনত্ব প্রবর্তনের এমন এক প্রক্রিয়া যা সমাজব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করে।"* **অধ্যাপক মেডিসন** (Maddison) মনে করেন, উন্নত দেশে আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দরিদ্র দেশে তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন হিসেবে অভিহিত।

প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ লক্ষ্য করা যায় :

পার্থক্যের বিষয়	অর্থনৈতিক উন্নয়ন	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
১. সংজ্ঞা	অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো এমন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যার দ্বারা দীর্ঘমেয়াদে একটি দেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়।	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় উৎপাদন এবং মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে।
২. পরিবর্তন	কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে আধুনিকায়নকে নির্দেশ করে।	এর মাধ্যমে উৎপাদন এবং মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তন সাধন বোঝায়।
৩. ধারণা	উন্নয়ন পরিমাণগত ধারণার পাশাপাশি একটি গুণগত ধারণা প্রকাশ করে।	প্রবৃদ্ধি পরিমাণগত ধারণা প্রকাশ করে।
৪. নির্ভরতা	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।	অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া প্রবৃদ্ধি সম্ভব।
৫. ভিন্নতা	বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ভিন্ন ভিন্ন হবে।	দুটি দেশের প্রবৃদ্ধি এক হতে পারে।
৬. মেয়াদ	এটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়।	এটি স্বল্পমেয়াদি প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়।
৭. সূত্র	অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + কাঠামোগত পরিবর্তন।	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি = অর্থনৈতিক উন্নয়ন – কাঠামোগত পরিবর্তন।
৮. আওতা	উন্নয়নের আওতা ব্যাপক ও বিস্তৃত।	প্রবৃদ্ধির আওতা উন্নয়ন অপেক্ষা সংকীর্ণ।

* ". . . development is an innovative process leading to the structural transformation of social system."

পার্থক্যের বিষয়	অর্থনৈতিক উন্নয়ন	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৯. নির্ণয়	অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ণয় করা জটিল ও অধিক সময়সাপেক্ষ।	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ণয় করা তুলনামূলকভাবে সহজ ও কম সময় সাপেক্ষ।
১০. শর্ত	অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো দীর্ঘকাল ধরে ঊর্ধ্বমুখী ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জন।	প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অনুকূল সুযোগ-সুবিধা, উপকরণের সহজলভ্যতা তথা বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ প্রয়োজন।
১১. আর্থ-সামাজিক প্রভাব	অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে।	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দ্বারা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন সাধন হয় না।
১২. চিত্র	অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির গড় হার নির্দেশ করে। চিত্রে OD রেখা উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে।	প্রবৃদ্ধির উত্থান-পতন হতে পারে। চিত্রে GG বক্র রেখা প্রবৃদ্ধি রেখা নির্দেশ করে।

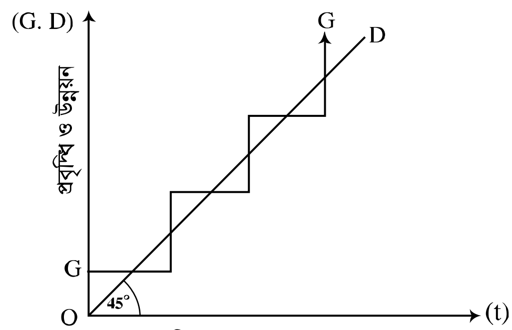

চিত্র : ১০.১ :.১

প্রবৃদ্ধির উত্থান-পতনের কারণে GG রেখাটি কখনও গড় অবস্থানের (45° রেখার) ওপরে বা নিচে অবস্থান করতে পারে। কিন্তু উন্নয়ন হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিক 'গড়' মান যা ঊর্ধ্বমুখী হয়।

ওপরিউক্ত পার্থক্য থেকে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রশ্ন জড়িত। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে তা যদি অল্প লোকের হাতে কেন্দ্রিভূত হয় তবে এ আয় বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায় না। উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য।

David Lehmann মন্তব্য করেন, "কোনো আর্থিক পরিকল্পনায় যদি দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও আয় বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত না থাকে তবে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলা যাবে না।"

উন্নয়ন ধারণাটি প্রবৃদ্ধির ধারণা অপেক্ষা ব্যাপক জটিল ও নির্ণয় সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

আলোচনা থেকে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলেই মন্তব্য করা যাবে যে, প্রবৃদ্ধি সংঘটিত হচ্ছে; কিন্তু শুধু প্রবৃদ্ধি সংঘটিত হলেই উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে, তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল নির্ধারকসমূহ

Mejor Determinants of Economic Development

মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের ধনাত্মক পরিবর্তনকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে তোলা, অধিবাসীদের নৈপুণ্য ও শ্রমশক্তি বৃদ্ধি করা, দেশে বস্তুগত এবং মানবীয় মূলধনের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করা এবং উন্নত সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করা– এসব পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধারায় পদে পদে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংগঠনিক নানা ধরনের বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়।

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকগুলো উপাদানের ওপর নির্ভর করে। যে সকল উপাদান দ্বারা আবশ্যকীয়ভাবে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভাবিত হয়, সেগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল নির্ধারক বলে। যেমন :

১. **প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources) :** যে সকল দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, সে সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ যেমন– তেল, মূল্যবান ধাতব পদার্থ; সোনা, হীরা, প্লাটিনামসহ নানান মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর হয়।

২. **মূলধন গঠন পদ্ধতি (Methods of Capital formation) :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো মূলধনের গঠন। মূলধন গঠন বলতে শুধুমাত্র অর্থসম্পদকেই নির্দেশ করে না। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তির পর্যাপ্ত যোগান, উন্নত যাতায়াতব্যবস্থা, পানি সেচব্যবস্থা, অনাবাদি জমি উদ্ধার ও চাষের আওতায় নিয়ে আসা, আধুনিক কৃষি ও শিল্প যন্ত্রপাতির পর্যাপ্ত যোগান সুনিশ্চিত করা এরূপ বস্তুগত মূলধন গঠন বৃদ্ধির পাশাপাশি পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল।

৩. **শ্রমশক্তি ও উৎপাদনশীলতা (Labor force and Productivity) :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন দক্ষ শ্রমশক্তির ওপর নির্ভরশীল। যে দেশের শ্রমশক্তি যত দক্ষ, সুনিপুণ হবে; সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত দ্রুত এবং মসৃণ হবে। কারণ দক্ষ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা অধিক হয়।

৪. **আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো (Socio-Politico – economic Structure) :** দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেকোনো দেশের মজবুত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি আবশ্যক। উন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো (যেমন : আধুনিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, জনস্বাস্থ্য, বাসস্থান, পরিবার কল্যাণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা, উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, ডাক, তার, টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাঁধ, সেতু, শক্তিসম্পদ, পানি সরবরাহ প্রভৃতি) এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সর্বজনীন বিশ্বাসযোগ্যতা এসব উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

৫. **ভৌগোলিক সুবিধা (Geographical advantage) :** প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক সুবিধা পৃথক পৃথক ধরনের হয়। এ ভৌগোলিক সুবিধা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। যেমন : বাংলাদেশের দু'দিকে দু'টি পৃথিবীর বৃহৎ প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা। একটি ভারত অপরটি চীন। এছাড়াও বাংলাদেশের রয়েছে ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা, গভীর সমুদ্রে যাতায়াতের উন্মুক্ত পথ, নদী ও সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর প্রভৃতি। এসব কারণে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রভৃতি অর্থনৈতিক পরাশক্তিসমূহের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করছে।

৬. **সুবিচার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা (Establishing Justice and Fairness) :** অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই (Sustainable) এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য প্রয়োজন সমাজ বা রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে উন্নয়নমুখী জনগণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সুবিচার ও ন্যায্যতা নিশ্চিত হয়। সেরূপ সমাজে উন্নয়নটা টেকসই হবে।

৭. **প্রযুক্তি (Technology) :** উৎপাদনের উপকরণসমূহকে নিয়োগের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন লাভের উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব দক্ষতার সাথে উৎপাদনকার্যে উপকরণ নিযুক্ত করার কৌশলকে প্রযুক্তি বলে। এর গুরুত্ব সম্পর্কে J. Schumpeter বলেন, '... technological progress is the only determinant of economic progress.' বর্তমানে যেসকল দেশ প্রযুক্তিকে যত বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে উক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ততবেশি দ্রুত এবং টেকসই হচ্ছে।

৮. **গ্রামীণ উন্নয়ন (Rural development) :** সাধারণত গ্রামের জনগণ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির দিক থেকে শহরের জনগণ হতে পিছিয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশের মত গ্রাম প্রধান দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হলে গ্রামীণ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা আবশ্যক।

৯. **আর্থিক ও রাজস্বনীতি (Monetary and Fiscal Policy) :** যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেদেশের আর্থিক নীতি (কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত) এবং রাজস্বনীতি (সরকারি ব্যয়, কর ও ভর্তুকি প্রভৃতি) দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাণিজ্য চক্রের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে সুরক্ষা দিয়ে উন্নয়নকে এ নীতিসমূহ প্রভাবিত করে থাকে।

১০. **জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic dividends) :** একটি দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ যদি কর্মহীন জনসংখ্যার তুলনায় বেশি হয়, তাহলে এ অবস্থাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বা জনমিতিক লভ্যাংশ বলে। বাংলাদেশে ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া এ স্বর্ণালি ক্ষণটি ২০৩৮ সাল পর্যন্ত থাকবে। একটি দেশের ৬০ শতাংশ যদি কর্মক্ষম হয় তাহলে দেশটি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট পাচ্ছে বলে ধরে নেয়া হয়। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এর ওয়ার্ল্ড পপুলেশন স্টেট অনুসারে ১৫–৬৪ বছর বয়সীদের কর্মক্ষম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে ২০০৭ সালে এ হার ৬১% হলেও ২০২১ সালে ৬৮%। জনসংখ্যার আধিক্য এখন এক নম্বর সমস্যা নয় বরং অপার সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে যদি এ শক্তিকে কাজে লাগানো যায়। এ জনমিতিক লভ্যাংশ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

১১. **বাহ্যিকতা (Externalities) :** কিছু বাহ্যিকতা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। যেমন বৈদেশিক সাহায্য (নমনীয় শর্তযুক্ত বা শর্তহীন), প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI), অনুদান ও দান। রপ্তানির ক্ষেত্রে কোটামুক্ত সুবিধা প্রভৃতি। এসব সুবিধা যে দেশ অধিক লাভ করবে, তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ততবেশি বেগবান ও সমৃদ্ধ হবে।

১২. **অ-কৃষিখাতে বিনিয়োগ (Investment in non-agricultural Sector) :** অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য, দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য (কৃষি পণ্যের দাম কম) অকৃষি খাতের সম্প্রসারণ এবং এখাতে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন।

১৩. **বিশ্বায়ন ও প্রতিযোগিতা (Globalization and Competition) :** বিশ্বায়ন হচ্ছে এরূপ একটি প্রক্রিয়া যা অধিক জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী অধিক বাজার, অধিক ব্যবসায় এবং অধিক অর্থনীতির মধ্যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটে। বিশ্বায়নের ফলে উপকরণের গতিশীলতা লাভ, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিনিময়, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার ও বাণিজ্য উদারীকরণ, অধিক উৎপাদন, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর অনুপস্থিতি, জীবনের মানোন্নয়নসহ নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন ঘটে।

এছাড়াও একটি দেশের উন্নয়নমনস্ক জনগণ ও উদ্যোক্তা; সমৃদ্ধ জিডিপি; বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত মজুদ প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মোট জাতীয় আয় এর বার্ষিক চলমান বৃদ্ধি বা পরিবর্তনের হারকে প্রবৃদ্ধি বলে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন : অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কোনো দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার অগ্রগতি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, সরকারি কর্মকাণ্ড ও নীতিসমূহের সমন্বিত বাস্তবায়ন প্রভৃতি নির্দেশ করে।

পাঠ ১০.২ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ
Major Obstacles of Economic Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মূলপাঠ :
অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ
Major Obstacles of Economic Development

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর মধ্যে কিছু দেশ অর্থনৈতিকভাবে খুব সমৃদ্ধ এবং কিছু দেশ বা অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, খুবই দুর্বল। এ দেশসমূহ এর মধ্যে কিছু দরিদ্র দেশ বা অনুন্নত এবং কিছু উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে। এ গরিব বা অনুন্নত দেশসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায়গুলোকে তারা অতিক্রম করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে।

<table>
<tr><td rowspan="4">বিশ্বব্যাংক-এর হিসাব মতে :
নিম্ন আয়ের দেশ : মাথাপিছু আয় ১০৪৫ মার্কিন ডলারের নিচে
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ : ১০৪৬ হতে ৪১২৫ মার্কিন ডলার
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ : ৪১২৬–১২৭৩৬ মার্কিন ডলার
উচ্চ আয়ের দেশ : যেসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ১২৭৩৭ মার্কিন ডলার এর অধিক।
বাংলাদেশের জনগণের অর্জিত মাথাপিছু আয়ের ফলে (মার্চ ১৯, ২০১৯; ১৯০৯ মার্কিন ডলার) বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃত।</td><td colspan="2">জাতিসংঘের হিসাব :
২০১৮ সালে UNCDP (কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি) মূল্যায়ন :</td></tr>
<tr><td>উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রয়োজন</td><td>বাংলাদেশ-এর অর্জিত পয়েন্ট</td></tr>
<tr><td>* অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে ৩২ এর নিচে থাকতে হবে
* মানবসম্পদ সূচকে ৬৬
* মাথাপিছু আয় ১২৩০ মার্কিন ডলার
২০২১ সালের UNCDP পর্যালোচনায় :</td><td>২৫.২
৭৩.২
১২৭৪ (এটলাস পদ্ধতি)</td></tr>
<tr><td>* অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে ৩২ এর নিচে থাকতে হবে
* মানবসম্পদ সূচকে ৬৬
* মাথাপিছু আয় ১২২২ মার্কিন ডলার বা তার কিছু বেশি
ফলে, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সুপারিশ লাভ করেছে।</td><td>২৭.২
৭৫.৩
গত ৩ বছরের গড় ১৮২৭</td></tr>
</table>

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান অন্তরায়গুলো নিম্নরূপ :

১. **উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিরক্ষরতার হার (High Population Growth and illiteracy rate) :** অনুন্নত, স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক। অধিকাংশ জনগণই নিরক্ষর যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় স্বরূপ। এ সকল দেশসমূহে সম্পদ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক হওয়ায় এবং নিরক্ষরতা দূর করে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের হার কম হওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

২. **দুর্বল অবকাঠামো (Poor infrastructure) :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। যে সকল দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো শক্তিশালী সে সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হয়।

৩. **মানবীয় মূলধনের অপর্যাপ্ততা/অপ্রতুলতা (Human Capital inadequacies) :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবীয় মূলধনের পর্যাপ্ত যোগান থাকা আবশ্যক। যে সকল দেশ মানবীয় মূলধনে সমৃদ্ধ, সে সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত সাধিত হয়।

৪. **সঞ্চয় ব্যবধান এবং অপর্যাপ্ত মূলধনের গঠন (Savings gap and Inadequate Capital accumulation) :** অনুন্নত দেশসমূহের মানুষের ভোগ প্রবণতা অধিক সঞ্চয় প্রবণতা কম। এমনিতেই জনগণের আয় স্বল্প, বেকারত্ব ও ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান। আয়ের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই ভোগ ব্যয়ে ব্যয় করাতে সেখানে সঞ্চয় সৃষ্টি করা যায় না, সে কারণে মূলধন গঠনের হারও নিম্ন হয়। কারণ সঞ্চয়ই হলো মূলধন গঠনের ভিত্তি।

৫. **দুর্নীতি (Corruption) :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হলো দুর্নীতি। যে সমাজে দুর্নীতি যত বেশি, সে সমাজ তত বেশি পিছিয়ে থাকে। দুর্নীতি উন্নয়নের সব সুফল নষ্ট করে দেয়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির হার ও প্রবণতা অধিক বিধায় এ সকল দেশ উন্নয়নের পথে হাঁটতে পারে না বা বাধা প্রাপ্ত হয়।

৬. **অদক্ষ সরকার (Inefficient Governments) :** দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ সরকার ও প্রশাসনব্যবস্থা। কিন্তু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে প্রায়শই সরকার এবং প্রশাসন অদক্ষ হয় বিধায় উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে না। একারণে এখানে সম্পদের ব্যবহার পুর্নমাত্রায় হয় না বা অপচয় হয়।

৭. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা (Political Instability) :** দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরি। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া দেশীয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে প্রায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকে।

৮. **লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Inequlity) :** সমাজে নারী-পুরুষ সবাইকে উন্নয়নের পথে সকল কর্মক্ষেত্রে বাঁধাহীনভাবে অংশ নেয়ার বা অবদান রাখার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক প্রায় নারী। যে সমাজে নারী-পুরুষ সকল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে বৈষম্যহীনভাবে কর্মে প্রবেশের ক্ষেত্রে বা প্রাপ্য মজুরি বা সম্মানীর ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করার মাধ্যম্যে অন্যায্য আচরণ করা হয়, সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সঠিকভাবে সম্ভব নয়।

৯. **মূলধন বিনিয়োগের অভাব (Lack of capital Investment) :** অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত মূলধনের সংকট বা অভাব রয়েছে। এছাড়াও যে পরিমাণ মূলধন রয়েছে, সে স্বল্প মূলধনও প্রকল্প বাছাইয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে ব্যবহার হয় না। মূলধন বিনিয়োগের অভাবই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

১০. **দুর্বল বাণিজ্য শর্ত (Poor terms of trade) :** অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে বাণিজ্য শর্ত সর্বদাই তাদের প্রতিকূলে থাকে। উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাণিজ্য শর্তকে উন্নত দেশগুলো প্রভাবিত করে তাদের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকেও অনুন্নত দেশগুলো প্রত্যাশিত বা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নয়ন সহায়তা লাভ করতে পারে না। কারণ অনুন্নত দেশগুলো কম দামে প্রাথমিক ‘কৃষিজ পণ্য’ উৎপাদন এবং রপ্তানি করে, পক্ষান্তরে উন্নত দেশগুলো অধিক দামের ‘শিল্প পণ্য’ উৎপাদন ও রপ্তানি করে।

১১. **অপর্যাপ্ত প্রযুক্তি (Inadequate technology) :** অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। এ সকল দেশের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সবই প্রায় সনাতন পদ্ধতির। তাই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সঠিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকবলও তারা তৈরি করতে পারেনি।

১২. **জাতিগত এবং ধর্মীয় সংঘাত (Ethnic and religious conflict) :** যেকোনো দেশে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম বা গোষ্ঠীর সহঅবস্থান বিদ্যমান থাকে বা থাকাই স্বাভাবিক। নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঐ দেশে সকল জাতি, ধর্মের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কারণ জাতিগত বা ধর্মীয় সংঘাত উক্ত সমাজ বা দেশের উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করবে।

১৩. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Calamities) :** যে দেশে প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ (বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সুনামী, ভূমিকম্প ... প্রভৃতি) বার বার আঘাত করে, সে দেশ উন্নয়ন কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

১৪. **দুর্বল স্বাস্থ্য পরিসেবা (Poor Health Care) :** দুর্বল স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে সুস্থ, সবল জাতিগঠন সম্ভব নয়। এরূপ পরিষেবার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনও সম্ভব নয়, বার বার বাধাগ্রস্ত হবে উন্নয়ন কর্মসূচি। কোভিড-১৯ অতিমারি (মহামারি) সমগ্র বিশ্বকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে এখনো অনেক কাজ আমাদেরকে করতে হবে।

এছাড়াও অনিরাপদ পানি সরবরাহ (Unsafe water supplies), নিম্ন স্তরের সামাজিক কল্যাণ (low levels of social welfare), বিভিন্ন প্রকার অসমতা (inequalities), বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবধান (Foreign Currency gap-প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সংকট) এবং গৃহযুদ্ধের প্রভাব (impact of civil war) অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ

Obstacles to economic development in Bangladesh

বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অতিক্রম করেছে। পাঁচ দশক পূর্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলো দেশ যেমন– দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর যে অবস্থানে ছিল, সে তুলনায় তখন পূর্বপাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) তেমন পিছিয়ে না থাকলেও বর্তমানে ঐ সকল দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :** বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। কিন্তু অনেক অনুন্নত দেশের তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশে যেটুকু অধিক রয়েছে তাও সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পূর্ব হতেই ব্যবহার করা হয়নি, অপচয় হয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত হতে পারে নি।

২. **অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ :** বাংলাদেশের আয়তন এবং প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক। এ উচ্চ জনসংখ্যা দেশের জমি, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। এর ফলে মাথাপিছু উৎপাদন, আয়, সঞ্চয়, মূলধন গঠন সবই নিম্নহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

৩. **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র :** বাংলাদেশে দরিদ্রতা একটি বড় সমস্যা। কম সঞ্চয়-কম বিনিয়োগ-কম উৎপাদন-কম আয়-কম সঞ্চয়, এরূপ দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ থাকায় স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘসময় অতিক্রমের পর সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের সময় বাংলাদেশ অনুন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে।

৪. **মূলধন গঠনের হার নিম্ন :** দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের কারণে বাংলাদেশের জনগণের আয় কম, এজন্য সঞ্চয় এবং মূলধন গঠনের হারও কম হয়। এছাড়া, দেশের রপ্তানির চেয়ে আমদানি অনেক বেশি বিধায় মূলধন গঠনের হার নিম্ন হয় যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধা সৃষ্টি করে।

৫. **শিক্ষার অভাব :** শিক্ষার হার কম বা শিক্ষার অভাবই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে রুদ্ধ করে। শিক্ষার প্রসার না ঘটলে, দেশের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে, মানব সম্পদের গতিশীলতা, উৎপাদনশীলতা সীমিত হয়ে পড়ে।

৬. **কারিগরি জ্ঞান ও উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য কারিগরি জ্ঞান ও উপযুক্ত প্রযুক্তি অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান ছাড়া উন্নত প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং তার যথাযথ ব্যবহার সম্ভব নয়। বাংলাদেশে বিশ্বমানের সময় উপযোগী উপযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রসারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

৭. **পর্যাপ্ত মানব সম্পদের অভাব :** যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুপ্রশিক্ষিত, দক্ষ পর্যাপ্ত মানব সম্পদের প্রাচুর্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে এ মানের মানব সম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৮. **উদ্যোক্তার অভাব :** দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্রোতে ভাসাতে চাইলে প্রয়োজন দেশপ্রেমিক, দক্ষ ও সাহসী উদ্যোক্তা। কিন্তু দীর্ঘসময় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ নীতি এবং সরকারি সমর্থনসূচক কর্মপরিকল্পনা না থাকায় বাংলাদেশে এরূপ উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে।

৯. **অবকাঠামোর অভাব :** যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উন্নত অবকাঠামো। বাংলাদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পদের ঘাটতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার এখনও কিছু অভাব রয়েছে। তাই এদেশে উপকরণের গতিশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা কম এবং বাজারও সীমিত।

১০. **প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য :** একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা। কিন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে তীব্র প্রতিকূলতা বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত পুরাতন ও বৃহৎ দেশগুলোর সাথে সর্বদাই চরম প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এসব দেশগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় অপেক্ষা আমদানি ব্যয় অনেক বেশি।

এছাড়াও অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, খাদ্য ঘাটতি, সামাজিক কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যেসব বাধা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দূর করার উপায় হলো–রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা, অবকাঠামোর উন্নয়ন, রপ্তানি বৃদ্ধি, শিল্পায়ন বা শিল্পের প্রসার ঘটানো, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষিতে জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগ, ঋণ খেলাপী সংস্কৃতির অবসান; স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নিশ্চিতকরণ; আন্তর্জাতিক নীতিতে কৌশলগত অবস্থান, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি, উদ্বৃত্ত পণ্যের রপ্তানি, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানি, বাজারের বিস্তৃতি, একচেটিয়াত্ব প্রতিরোধ, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার প্রভৃতি।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধাসমূহ হচ্ছে- প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, মূলধন গঠনের হার নিম্ন, কারিগরি জ্ঞান ও উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব, পর্যাপ্ত মানব সম্পদের অভাব, উদ্যোক্তার অভাব, প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি।

পাঠ ১০.৩ স্যুম্পিটারের উন্নয়ন তত্ত্ব
Schumpeter's theory of development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- স্যুম্পিটারের উন্নয়ন তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :

অর্থনৈতিক মডেল / তত্ত্ব (Economic Model or Theory)

অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি/উন্নয়ন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এক-একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এছাড়াও বিবেচনাধীন চলকগুলোর অতীত ও বর্তমান আচরণ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে এদের ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের এরূপ পর্যালোচনায় অনেক তত্ত্ব বা মডেল রয়েছে। যেমন :

ক. স্যুম্পিটারের উন্নয়ন তত্ত্ব

খ. রোজেনস্টেইন রোডান এর বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্ব

গ. হ্যারড-ডোমার মডেল

ঘ. রস্টোর প্রবৃদ্ধি/উন্নয়ন তত্ত্ব

ঙ. লুইস মডেল/উদ্বৃত্ত শ্রম সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রভৃতি।

ক. স্যুম্পিটারের উন্নয়ন তত্ত্ব

Schumpeter's theory of development

প্রফেসর জোসেফ এলোইস সুম্পিটার (Professor Joseph Alois Schumpeter) ১৯১১ সালে তাঁর 'The Theory of Economic Development in German' গ্রন্থে পুঁজিবাদের বিকাশ এবং ধ্বংস সম্পর্কে যে বক্তব্য তুলে ধরেন, তাই স্যুম্পিটারের উন্নয়ন তত্ত্ব নামে পরিচিত।

তত্ত্বের বিশ্লেষণ : স্যুম্পিটারের তত্ত্বের মূল কথা হলো, পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্থির ভারসাম্যে অবস্থান করে না বরং ভারসাম্য থেকে দূরে সরে গিয়ে একটি চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খায়। এ চক্র থেকে অর্থনীতিকে বের করে আনতে পারলেই অর্থনীতিতে গতি আসবে। স্যুম্পিটারের প্রবৃদ্ধি/উন্নয়ন মডেলকে কয়েকটি বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন :

(ক) **স্থবির অর্থনীতি :** পুঁজিবাদে প্রাথমিক অবস্থায় অর্থনীতি স্থির ভারসাম্যে অবস্থান করলেও পরবর্তীতে তা বিচ্যুত হয়। এ ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার মুনাফা হ্রাস পেলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দেয় এবং কারিগরি বিকাশ রুদ্ধ হয়। এ স্থির ভারসাম্য থেকে উত্তরণের জন্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রয়োজন পড়ে।

(খ) **নতুন কৌশল :** অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে এগিয়ে আসে। মুনাফা বৃদ্ধির জন্য তারা নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ দ্বারা অর্থনীতির গতিশীলতা বাড়ায়। এতে নিত্যনতুন পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরনো পণ্যের মানও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ও যোগান বাড়ার ফলে বাজার সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টি হয়। শিল্পক্ষেত্রে নতুন সাংগঠনিক কাঠামোর উন্মেষ ঘটে। দেশে উন্নয়নের চাকা বেগবান হয়।

(গ) **উদ্যোক্তার অবদান :** উন্নয়নের গতি সঞ্চারের ফলে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়। বিনিয়োগ বেড়ে যায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়। পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে উদ্যোক্তার মুনাফা বৃদ্ধি পায়; তাদের মেধা ও দক্ষতা আরও

বেশি কাজে লাগায়। ফলে বাজার সম্প্রসারণ হয় এবং উন্নয়নের গতি আরও বেড়ে যায়। স্যুম্পিটার মনে করেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উদ্যোক্তার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং তারা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

(ঘ) **অর্থনীতির শীর্ষাবস্থা :** পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা বা সংগঠকের উদারনীতির কারণে অর্থনীতির গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সহজলভ্য ব্যাংক ঋণ ব্যবহার করে উদ্যোক্তারা উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক মুনাফা লাভ করে। নতুন উদ্যোক্তারা এতে উৎসাহিত হয়ে নতুনভাবে বিনিয়োগ করে। কর্মসংস্থান বাড়ে। জনগণের আস্থা ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার ফলে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ে। এতে মুনাফার গতি ত্বরান্বিত হয়। এভাবে শিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনীতি তার শীর্ষাবস্থা বা চূড়ায় আরোহণ করে।

(ঙ) **পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি :** অর্থনীতি যখন শীর্ষাবস্থায় অবস্থান করে তখন ব্যাংক ঋণের অবাধ প্রবাহ, বাজার সম্প্রসারণ, ভোক্তার আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে উৎপাদন বাড়বে। উদ্যোক্তারা বাড়তি উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করলে দ্রব্যের যোগান বেড়ে যাবে। ফলে দ্রব্যের দাম কমতে থাকবে। ইতোমধ্যে যেসব ফার্ম নতুনভাবে উৎপাদনে প্রবেশ করেছিল, সেগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত ফার্মগুলো শিল্প ত্যাগ করবে। ফার্মগুলো তাদের ব্যাংক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ফলে অর্থনীতি মন্দার কবলে পড়ে। নেমে আসে চূড়ান্ত বিপর্যয়। স্যুম্পিটার মনে করেন, তিনটি কারণে পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. উদ্যোক্তাদের অতি বস্তুবাদী আশা, যা পরবর্তীতে অসার প্রমাণিত হয়।

২. পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ কাঠামোর বিপর্যয়।

৩. অনুকূল রাজনৈতিক শক্তির বিলোপ এবং সুবিধাবাদীদের উত্থান।

(চ) ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ : পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতিতে অর্থনীতি ধ্বংসের মুখোমুখি হলেও অর্থনীতি সেখানে থেমে থাকে না। মন্দা থেকে পুনরায় পরিত্রাণ লাভ করে এবং এভাবে পুঁজিবাদের উত্থান-পতন চলমান থাকে।

স্যুম্পিটারের তত্ত্ব থেকে একথা পরিষ্কার যে, নতুন উদ্ভাবন ও উদ্যোগের কারণে পুঁজিবাদের বিকাশ যেমন সত্য তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কারণে পুঁজিবাদ বিনাশেরও আশঙ্কা থেকে যায়।

স্যুম্পিটারের মডেলের দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা : স্যুম্পিটারের তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত। এ মডেলের সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নরূপ :

১. স্যুম্পিটারের মডেলে উদ্ভাবনকে অতিগুরুত্ব দেয়া হয়। বাস্তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনের পাশাপাশি আরও অনেক অর্থনৈতিক চলক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজনীতি ও জনসংখ্যার একটি প্রভাব থাকে যা এ মডেলে উপেক্ষিত।

৩. পুঁজিবাদের অনিবার্য বিপর্যয়কে এ তত্ত্বে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির দিকে তাকালে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।

৪. ব্যাংক ঋণের যোগান স্থিতিস্থাপক বলে স্যুম্পিটার যে মত দিয়েছিলেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক ঋণের যোগান অস্থিতিস্থাপক।

৫. এ মডেলে উদ্যোক্তা বলতে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে উপেক্ষা করা হয়েছে; যা সঠিক নয়।

৬. কার্লমার্কস পুঁজিবাদের ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের সূচনার কথা বললেও স্যুম্পিটার সমাজতন্ত্রের বিকাশের কথা বলেননি।

৭. এ মডেলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আয়, ভোগ, সঞ্চয় এসব উপাদানের অবদানকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

সমালোচনা/দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্যুম্পিটারের উন্নয়ন তত্ত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

স্যুম্পিটারের উন্নয়ন তত্ত্ব : পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্থির ভারসাম্যে অবস্থান করে না। বরং ভারসাম্য থেকে দূরে সরে গিয়ে একটি চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খায়। এ চক্র থেকে অর্থনীতিকে বের করে আনতে পারলেই অর্থনীতিতে গতি আসবে। তবে নতুন উদ্ভাবন ও উদ্যোগের কারণে পুঁজিবাদের বিকাশ যেমন সত্য তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কারণে পুঁজিবাদ বিনাশেরও আশঙ্কা থেকে যায়।

পাঠ ১০.৪ রোজেনস্টেইন রোডান এর বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্ব
Big-Push Theory of Rosenstain Rodan

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- রোজেনস্টেইন রোডান এর বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :

খ. রোজেনস্টেইন রোডান এর বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্ব

Big-Push Theory of Rosenstain Rodan

১৯৪৩ সালে পল. এন রোজেনস্টেইন রোডান (Paul. N. Rosenstain Rodan) তাঁর Industrialization of Eastern & South Eastern Europe (পরবর্তীতে ১৯৬১ সনে মার্চে প্রকাশিত তাঁর Notes on the theory of the Big-Push in Economic Development...) প্রবন্ধে অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের বন্ধাত্বতার দুষ্টচক্রকে ভেঙ্গে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনটি অবিভাজ্যতার উল্লেখ করেন। এসব অবিভাজ্যতাকেই রোজেনস্টেইন রোডান-এর বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্ব (Big-Push Theory) নামে অভিহিত করা হয়।

এ তিনটি অবিভাজ্যতা হলো :

১. **উৎপাদন অপেক্ষকের অবিভাজ্যতা (Indivisibility in Production Function) :** রোজেনস্টাইন রোডান এর মতে, সামাজিক বুনিয়াদ (যেমন : বিদ্যুৎ শক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, আবাসন প্রভৃতি) সমৃদ্ধ অবস্থায় পুঁজি বিনিয়োগ করলে বাহ্যিক অর্থনৈতিক অসংখ্য সুবিধার উদ্ভব হয়। এসব ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করলে প্রত্যাশিত সুফল দেরীতে আসলেও লাভজনক পুঁজি বিনিয়োগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাঁর মতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবিভাজ্যতা বিরাজ করলে, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সুফল পাওয়া যাবে না। অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের জন্য সামাজিক বুনিয়াদের অঙ্গীভূত প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে–কোনো একক ক্ষেত্রে নয়।

২. **চাহিদার অবিভাজ্যতা (Indivisibility of Demand) :** অর্থনীতিতে যেখানে ক্ষুধার্ত মানুষ, ছদ্মবেশী বেকারত্ব রয়েছে, সেখানে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করতে হলে পারস্পরিকভাবে সমর্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে, এক শিল্প অপর শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য বা উপকরণের চাহিদার বাজার সৃষ্টি করবে। শিল্পসমূহে কর্মরত শ্রমিকরা ভোগের নিমিত্তে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করবে। এভাবে অসংখ্য শিল্পের উৎপাদন ও মুনাফা সৃষ্টি হলে বাজার সম্প্রসারণের মাধমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

৩. **সঞ্চয়ের অবিভাজ্যতা (Indivisibility of Saving) :** তাঁর মতে, অনুন্নত দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম কারণ শ্রমিকদের আয় স্বল্প। এ স্বল্প সঞ্চয়ই শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনগ্রসরতার জন্য দায়ী। যদি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল সংখ্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলেই শ্রমিকের কর্মসংস্থান বাড়বে, আয় বাড়বে এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

রোজেনস্টাইন রোডান মনে করেন, 'ধীরে চলো নীতি' অবলম্বন করলে অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জিত হবে না। এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বিরাজিত বন্ধাত্ব ভাঙ্গনের জন্য পারস্পরিকভাবে সমর্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্যে সর্বনিম্ন বাঞ্চিত পরিমাণের পুঁজি বিনিয়োগ অবশ্যই করা আবশ্যক। এটি রকেট ইঞ্জিনের মতো। রকেট ভূ-পৃষ্ঠকে বৃহৎ ধাক্কা দেয়ার মাধ্যমেই মহাকাশে যাত্রা করে। সেরূপ অনুন্নত অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে হলে সর্বনিম্ন কাঙ্ক্ষিত পরিমাণের পুঁজি একসাথেই বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্বের এটিই মূল কথা যে, ভারসাম্য বিশিষ্ট উন্নয়নে পৌঁছার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়ার জন্যই পারস্পরিকভাবে সমর্থিত বৃহৎ প্রকল্প একসাথে শুরু করতে হবে।

বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্বের সমালোচনা : দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে ভেঙ্গে উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে অনুন্নত দেশের জন্য 'বৃহৎ ধাক্কাতত্ত্ব' একটি জোরালো পদক্ষেপ হলেও অর্থনীতিবিদরা নিম্নোক্তভাবে সমালোচনা করেন।

১. সামাজিক বুনিয়াদ গঠনের মাধ্যমে অর্জিত বাহ্যিক অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করার ব্যাপারে অনুন্নত দেশের ক্ষমতা সীমিত। তাই বৃহৎ ধাক্কার মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ধরে রাখা অসম্ভব ব্যাপার।

২. সামাজিক বুনিয়াদ সৃষ্টি এবং প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন করে সুফল পেতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলো এত দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে পারে না।

৩. অনুন্নত দেশগুলোর অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাহ্যিক অর্থনৈতিক সুবিধার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে না বরং বৈদেশিক আর্থিক সুবিধার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

৪. অনুন্নত দেশগুলোর রপ্তানি আয় (প্রাথমিক পণ্য রপ্তানির কারণে) অপেক্ষা আমদানি ব্যয় (শিল্পজাত পণ্য আমদানি) অধিক হয়। এ ঘাটতি সামাজিক বুনিয়াদ সৃষ্টির দ্বারা সম্ভব নয়।

৫. অনুন্নত দেশের বড় বড় এবং পারস্পরিকভাবে সমর্থিত শিল্প বা প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষমতা/সামর্থ্য নেই। এছাড়া দক্ষ শ্রমিক, অভিজ্ঞ ও পুঁজিনির্ভর উদ্যোক্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও অনুন্নত দেশের উন্নয়নের গতিকে বেগবান করার লক্ষ্যে বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্বের ধারণাকে সামনে রেখে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নে এ তত্ত্বের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

রোজেনস্টেইন রোডান এর বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্ব : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবিভাজ্যতা বিরাজ করলে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সুফল পাওয়া যাবে না। অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের জন্য সামাজিক বুনিয়াদের অঙ্গীভূত প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে, কোনো একক ক্ষেত্রে নয়। অর্থনীতিতে যেখানে ছদ্মবেশী বেকারত্ব, ক্ষুধার্ত মানুষ রয়েছে সেখানে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করতে হলে পারস্পরিকভাবে সমর্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। অনুন্নত দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম যার ফলে বিপুল সংখ্যায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হয় না। তাই এখানে প্রয়োজন বৃহৎ ধাক্কা। ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করলে অনুন্নত দেশে প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জিত হবে না।

পাঠ ১০.৫ হ্যারড-ডোমার প্রবৃদ্ধি মডেল
Harrod–Domar Growth Model

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- হ্যারড-ডোমার প্রবৃদ্ধি মডেল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :

গ. হ্যারড-ডোমার প্রবৃদ্ধি মডেল

Harrod–Domar Growth Model

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণে Harrod–Domar Model একটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল হিসেবে বিবেচিত। শুরুতে R. F. Harrod (1939) এবং E. Domar (1948) পৃথকভাবে তাঁদের মডেল ব্যাখ্যা করলেও দু'জনের মূল বক্তব্য একই রকম হওয়াতে দু'টি মডেলকে সমন্বিতভাবে Harrod–Domar Growth Model হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। Harrod–Domar Model এর অনুমিত শর্ত :

১. উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে শ্রম ও মূলধনকে বিবেচনা করা হয়। যেখানে শ্রম সমজাতীয়।

২. বদ্ধ অর্থনীতিতে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান।

৩. সরকারি হস্তক্ষেপ অনুপস্থিত।

৪. প্রযুক্তিগত বিকাশ স্থির থাকবে।

৫. উৎপাদন প্রবাহে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বিবেচিত।

৬. দামস্তর ও সুদের হার নির্দিষ্ট থাকবে।

৭. প্রকৃত সঞ্চয় এবং প্রকৃত বিনিয়োগে সমতা থাকবে, যেখানে বিনিয়োগ হবে স্বয়ম্ভূত।

মূলবক্তব্য : হ্যারড–ডোমার মূলত উন্নত দেশের প্রেক্ষাপটে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। উন্নত দেশের মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় বরং পূর্ণনিয়োগস্তরে উন্নয়ন ধরে রাখা। কাজেই অর্থনীতিতে পূর্ণনিয়োগ স্তরের ভারসাম্য কীভাবে ধরে রাখা যায়, সে পথ খুঁজে বের করাই হলো Harrod–Domar মডেলের মূল লক্ষ্য। পূর্ণ নিয়োগস্তরে ভারসাম্য অবস্থায় অর্থনীতিতে অস্বাভাবিক বেকারত্ব কিংবা অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি থাকে না। তাই Harrod–Domar একটি Steady growth rate বজায় রাখার পক্ষে যুক্তি দেন।

Harrod–Domar এর মতে, পূর্ণনিয়োগস্তরে ভারসাম্য প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে হলে অর্থনীতিতে নিট বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, যা সঞ্চয়কে কাজে লাগিয়ে সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায়, পর্যাপ্ত সঞ্চয় ব্যবহার করে অর্থনীতিতে নিট বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার এমনভাবে চালু রাখতে হবে যেন পূর্ণনিয়োগে ভারসাম্য প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকে। ফলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি কিংবা মন্দাভাব থাকবে না। অর্থনীতি একটি সুন্দর ও মসৃণপথ (Golden Path) ধরে এগিয়ে যাবে। অন্যদিকে Harrod–Domar এ বক্তব্যও দেন, পূর্ণনিয়োগ অবস্থা থেকে বিচ্যুত অবস্থায় অর্থনীতিতে আয় বা উৎপাদন বাড়তে থাকলে চরম মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। আবার আয় বা উৎপাদন কমলে মন্দা ও বেকারত্ব দেখা দিবে।

মডেলের বিশ্লেষণ

(ক) বিনিয়োগের দ্বৈত ভূমিকা : একটি দেশের অর্থনীতিতে মূলধন মজুতের প্রসার ঘটে, যখন সে দেশের অর্থনীতিতে নিট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। আবার নিট বিনিয়োগ সংগঠিত হয় সঞ্চয় প্রবণতার মাধ্যমে। অর্থাৎ এ মডেলে বিনিয়োগের দ্বৈত ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

(i) বিনিয়োগ আয় সৃষ্টি (Income creation) করে।

(ii) বিনিয়োগ মূলধন মজুতের প্রসার তথা সামর্থ্যের সৃষ্টি (Capacity creation) করে। যেখানে নিট বিনিয়োগ প্রভাবিত হয় মূলধন–উৎপাদন অনুপাত (Capital–Output ratio) দ্বারা।

(খ) সম্ভাব্য উৎপাদনকে বাস্তব উৎপাদনে পরিণত করা : অর্থনীতিতে সম্ভাব্য উৎপাদনকে বাস্তব উৎপাদনে রূপ দিতে হলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো :

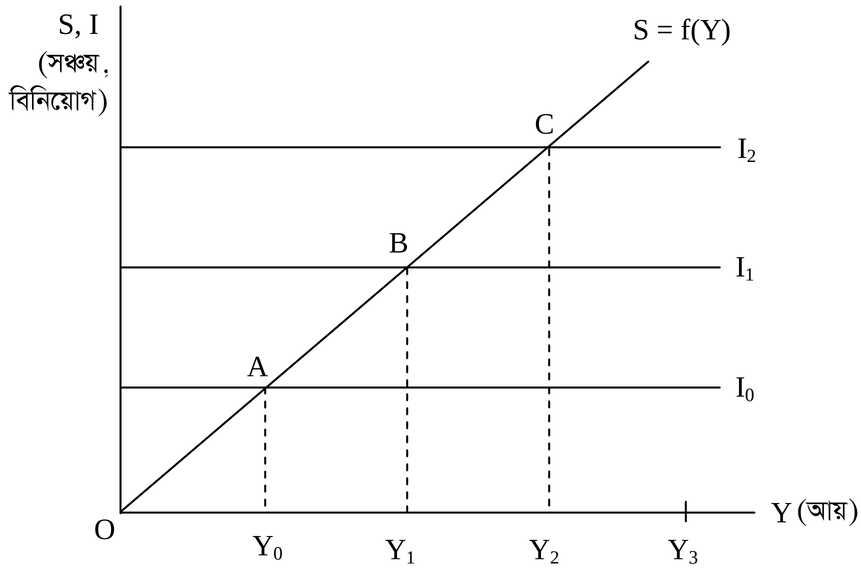

চিত্র ১০.২ : হ্যারড-ডোমার প্রবৃদ্ধি মডেল

চিত্রে লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং ভূমি অক্ষে আয়স্তর দেখানো হয়েছে। $S = f(Y)$ হলো সঞ্চয় রেখা এবং I_0, I_1 ও I_2 হলো স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা। A বিন্দুতে $I_0 = S$ ভারসাম্যাবস্থায় আয়স্তর OY_0, B বিন্দুতে $I_1 = S$ ভারসাম্যাবস্থায় আয়স্তর OY_1, C বিন্দুতে $I_2 = S$ ভারসাম্যাবস্থায় OY_2 আয়স্তর অর্জিত হয়, যা সম্ভাবনাময়ী বা সম্ভাব্য আয়স্তর। অনুরূপভাবে আমরা OY_3 সম্ভাব্য আয়স্তর অর্জন করতে পারি। OY_0, OY_1, OY_2 এবং OY_3 সম্ভাব্য আয়স্তরকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রসারিত হবে বলে Harrod–Domar মনে করেন।

(গ) ভারসাম্য প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা : অধ্যাপক Harrod তিনটি প্রবৃদ্ধির হারের কথা বলেছেন। যেমন : প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার (Actual rate of growth–G_A), অভীষ্ট বা কাম্য প্রবৃদ্ধির হার (Warranted rate of growth–G_W) এবং স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার (Natural rate of growth–G_N)। কোনো দেশের অর্থনীতিতে যখন $G_A = G_W = G_N$ হয়, তখন তাকে ভারসাম্য প্রবৃদ্ধির হার বলা হয়। অর্থাৎ অর্থনীতিতে অভীষ্ট প্রবৃদ্ধির হার (G_W) এবং স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার (G_N) সমান হলে পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্য প্রবৃদ্ধির হার বজায় থাকে। কাজেই পূর্ণ নিয়োগস্তরে প্রবৃদ্ধির হার তথা Golden Path ও Steady growth rate বজায় রাখতে হলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা উচিত যাতে $G_A = G_N$ হয়। উল্লেখ্য $G_A = G_W$ হলে এবং $G_A = G_N$ হলে অবশ্যই $G_W = G_N$ হয়। অর্থাৎ পূর্ণ নিয়োগস্তরে ভারসাম্য প্রবৃদ্ধির হারের জন্য $G_A = G_W = G_N$ হওয়া প্রয়োজন। অতএব, অর্থনীতিতে এমনভাবে নিট বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হবে যেনো $G_A = G_W = G_N$ বজায় থাকে।

(ঘ) ছুরিকার প্রান্ত (Knife–edge) এ অবস্থান : হ্যারড-ডোমার মডেলে তিনটি প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন : প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার (G_A), অভীষ্ট প্রবৃদ্ধির হার (G_W) এবং স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার (G_N)। হ্যারডের মতে যেহেতু পূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্যস্তরে $G_A = G_W = G_N$ তাই এ অবস্থা থেকে বিচ্যুত হলেই অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিবে। যেমন : $G_W < G_N$ হলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। আবার $G_W > G_N$ হলে মূলধন অব্যবহৃত থাকবে। তাই আয়, নিয়োগ,

উৎপাদন ও নিট বিনিয়োগ হ্রাস পাবে। ফলে অর্থনীতিতে অস্থিরতা এবং মন্দাভাব বিরাজ করবে। কাজেই $G_A = G_W = G_N$ এটি 'ছুরিকার ধার বা প্রান্ত' এর মতো। এটি কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিচ্যুত হলেই অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে।

হ্যারড-ডোমার মডেলের সীমাবদ্ধতা/সমালোচনা : প্রথমত, শ্রম-মূলধন অনুপাতটি এ মডেলে স্থির বা আনুপাতিক বিবেচনা করা হয়। কিন্তু স্থির উপাদান অনুপাত বিধি এ মডেলকে সংকোচিত করে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, এ মডেলে মূলধন-উৎপাদন অনুপাতকেও স্থির ধরা হয়। অথচ দীর্ঘকালে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত পরিবর্তিত হয়।

তৃতীয়ত, হ্যারড-ডোমার মডেলে সাধারণ দামস্তরকে স্থির ধরা হয়। এমনকি সুদের হারকেও স্থির ধরা হয়েছে। বাস্তবে দামস্তর পরিবর্তন হওয়া, মুদ্রাস্ফীতি হওয়া এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়াটা অর্থনীতির স্বাভাবিক আচরণ। এছাড়া উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ সুদের হারের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে।

চতুর্থত, এ মডেলে পুঁজির পুনঃব্যবহারের ওপর জোর প্রদান করলেও, উৎপাদনে শ্রম শক্তির প্রভাবকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। বাস্তবে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমশক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

পঞ্চমত, সামগ্রিক পরিকল্পনাকালে ভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ মডেল প্রযোজ্য হলেও অভারসাম্যবিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ মডেল প্রযোজ্য নয়। কারণ যেকোনো সময় সঞ্চয়-আয় এবং উৎপন্ন-আয় অনুপাত দু'টিই পরিবর্তন হতে পারে।

হ্যারড-ডোমার মডেলের সমালোচনা থাকলেও উন্নত দেশের অর্থনীতিতে উন্নত অবস্থা অব্যাহত রাখা এবং ভারসাম্য উন্নয়নের জন্য ইহা বাস্তবভিত্তিক মডেল হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হলেও মডেলটি পরোক্ষভাবে অনুন্নত দেশের উন্নয়ন নীতি নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। উন্নয়নের স্থিতাবস্থা অব্যাহত রাখার বিষয়ে হ্যারড-ডোমার মডেলের অভিজ্ঞতা উন্নয়নশীল দেশসমূহ কাজে লাগাতে পারে।

সারসংক্ষেপ

হ্যারড-ডোমার প্রবৃদ্ধি মডেল : হ্যারড-ডোমার মূলত উন্নত দেশের প্রেক্ষাপটে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। উন্নত দেশের মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় বরং পূর্ণনিয়োগস্তরে উন্নয়ন ধরে রাখা।

Harrod-Domar এর মতে, পূর্ণনিয়োগস্তরে ভারসাম্য প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখতে হলে অর্থনীতিতে নিট বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, যা সঞ্চয়কে কাজে লাগিয়ে সম্ভব। ফলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি কিংবা মন্দাভাব থাকবে না। অর্থনীতি একটি সুন্দর ও মসৃণপথ (Golden Path) ধরে এগিয়ে যাবে।

পাঠ ১০.৬ রস্টোর উন্নয়ন স্তর তত্ত্ব
Rostow's theory of stages of Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- রস্টোর উন্নয়ন স্তর তত্ত্ব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

মূলপাঠ :

ঘ. রস্টোর প্রবৃদ্ধি/উন্নয়ন স্তর তত্ত্ব

Rostow's theory of Growth/Stages of Development

যেকোনো দেশের অর্থনীতি কতগুলো স্তর (Stage) অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে। অর্থনীতিবিদ W.W. Rostow তাঁর 'The Stage of Economic Growth' গ্রন্থে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নের পাঁচটি স্তর উল্লেখ করেছেন। স্তরভিত্তিক আলোচনায় Rostow তাঁর তত্ত্ব সাজিয়েছেন বিধায় এটি প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন স্তর (পর্যায়) তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। এ পাঁচটি স্তর হলো যথাক্রমে–

ক. সনাতনী (চিরাচরিত) সমাজ–উন্নয়নের প্রথম স্তর/প্রাথমিক স্তর (Traditional Society–First stage or preleminary stage of Development)

খ. প্রাক্ উত্তরণ পর্ব/উত্তরণের পূর্ব অবস্থা–দ্বিতীয় স্তর (Pretake-off stage–Second Stage)

গ. উত্তরণ পর্ব–তৃতীয় স্তর (Take-off Stage–Third Stage)

ঘ. পরিপক্বতা অর্জনের স্তর–চতুর্থ স্তর (Stage of drive to maturity–Fourth Stage)

ঙ. গণভোগের স্তর–পঞ্চম স্তর (Mass Consumption Stage–Fifth Stage)

স্তরগুলোর বিশ্লেষণ :

ক. সনাতনী সমাজ/ উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর : সনাতনী সমাজব্যবস্থায় অর্থনীতি ছিল কিছুটা পশ্চাৎপদ। তখন বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলে পিছিয়ে ছিল বিধায় সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা কম ছিল। কৃষিজমির প্রচুর যোগান থাকলেও বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদনের অভাবে বাড়তি জমিকে কৃষিকাজের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। রস্টো সনাতনী সমাজের কিছু অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। যেমন–

(i) শ্রমসহ উপকরণের $\frac{৩}{৪}$ অংশ বা এর চেয়েও বেশি কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল।

(ii) সনাতনী পদ্ধতিতে পরিচালিত চাষাবাদ থেকেই জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগ আসতো।

(iii) ভূ-স্বামী বা সামন্তপ্রভুদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল।

(iv) সামাজিক গতিশীলতার অভাব ছিল এবং সামাজিক কাঠামো বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত ছিল।

খ. প্রাক্ উত্তরণ পর্ব : উন্নয়নের জয়যাত্রা শুরুর আগে কোনো দেশের অর্থনীতিকে কতগুলো পূর্বশর্ত বিবেচনায় নিতে হয়। এ পূর্বশর্ত পূরণের সময়কাল বা পর্যায়কে প্রাক্ উত্তরণ পর্ব বলা হয়। এ পর্যায়ে মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন আসে। উন্নয়ন, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে জাগরণ শুরু হয়। পুরনো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে সমাজে সবদিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন হয় এ পর্যায়ে। এ স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

(i) সঞ্চয়, বিনিয়োগ, মূলধন গঠন ও অবকাঠামো নির্মাণ শুরু।

(ii) কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার।

(iii) সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির পরিবর্তন তথা বিকাশমুখী সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

(iv) মূলধন দ্রব্যের আমদানি ও প্রয়োগ এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।

গ. উত্তরণ পর্ব : এ পর্বে প্রবৃদ্ধি অর্জন দ্রুত হয়। উন্নয়নে গতি সঞ্চার হয় এবং অর্থনীতি নিশ্চলতা কাঠিয়ে ওঠে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সূচিত হয়। প্রযুক্তি ও কৃৎকৌশলের অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব এবং চীন-রাশিয়ার রাজনৈতিক বিপ্লবের পর অর্থনীতিতে উত্তরণ পর্ব পরিলক্ষিত হয়। উত্তরণ পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

(i) নিট বিনিয়োগ, নিট জাতীয় উৎপাদনের সন্তোষজনক বৃদ্ধি (৫% থেকে ১০% এ বৃদ্ধি)।

(ii) কৃষি ও শিল্পের পাশাপাশি বিকাশ লাভ এবং কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ, শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি।

(iii) প্রযুক্তি ও কৃৎকৌশলের দ্রুত উন্নতি লাভ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার।

(iv) পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান। এতে বেসরকারি খাতে মূলধন-বিনিয়োগ বাড়ে।

(v) অর্থনৈতিক নিশ্চলতা কাটিয়ে ওঠে গতি সঞ্চার।

ঘ. পরিপক্কতা অর্জনের পর : রস্টোর উন্নয়নের চতুর্থ স্তরে উন্নয়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদে পরিচালিত হয়। এ স্তরে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ঘটে। সনাতনী উৎপাদন কৌশল বাতিল হয়ে যায়। সমাজের শীর্ষস্থানীয় খাতগুলো ক্রমে শক্তিশালী হয়। এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

(i) শ্রমিকের উচ্চতর দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা।

(ii) জনগণের উন্নয়ন আগ্রহের সৃষ্টিহেতু বিজ্ঞানমনস্ক উদ্যোক্তা ও দক্ষ পরিচালকের উদ্ভব।

(iii) কৃষির চেয়ে শিল্প নির্ভরতা বৃদ্ধি।

(iv) নিট বিনিয়োগ হার জাতীয় আয়ের ১০% বা তার অধিক এবং মাথাপিছু আয় দ্রুত বৃদ্ধি।

(v) অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অধিক হয়।

(vi) অনুকূল লেনদেন ভারসাম্যাবস্থা।

ঙ. গণভোগের স্তর : রস্টোর স্তরভিত্তিক উন্নয়ন তত্ত্বের চূড়ান্ত বা পঞ্চম স্তর হলো গণভোগের স্তর। চূড়ান্ত পর্যায়ে চাহিদার ব্যাপকতার কারণে যোগানভিত্তিক অর্থনীতির চেয়ে চাহিদামুখী অর্থনীতি গুরুত্ব পায়। কাজেই এ পর্যায়ে অর্থনীতি শীর্ষাবস্থায় অবস্থান করে বিধায় উৎপাদনের চেয়ে ভোগের ওপর বেশি নজর দেয়া হয়। এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

(i) মানসম্পন্ন ও টেকসই ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি।

(ii) অবস্থাসম্পন্ন উদ্যোক্তারা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়।

(iii) কর কাঠামো হয় প্রগতিশীল (Progressive)।

(iv) কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় বিধায় জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়।

(v) কল্যাণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠা হয় বিধায় রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

(vi) সর্বোপরি বিবেচ্য দেশটির আন্তর্জাতিক প্রভাব ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়।

রস্টোর মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন/প্রবৃদ্ধির পথে উল্লিখিত পাঁচটি স্তর অতিক্রম করলেই কেবল একটি দেশ উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছে।

রস্টোর উন্নয়ন তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা/দুর্বলতা : রস্টোর তত্ত্বের কিছু দুর্বলতা রয়েছে। যেমন–

১. রস্টোর তত্ত্বে পাঁচটি স্তর এর রূপরেখা দেওয়া আছে। কিন্তু এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে কীভাবে উত্তরণ ঘটবে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

২. একটি দেশের উন্নয়নে অর্থনৈতিক উপাদানের পাশাপাশি কিছু সামাজিক উপাদানও কাজ করে। কিন্তু রস্টোর তত্ত্বে সামাজিক উপাদানগুলোর কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

৩. রস্টোর উন্নয়ন তত্ত্বের উপযুক্ত পরিসংখ্যান ও পর্যবেক্ষণের অভাব আছে। এ কারণে দু'একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যসব দেশের জন্য তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

৪. উন্নয়নের তৃতীয় স্তরে উল্লেখ আছে–বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ১০% এর অধিক হবে। অথচ সাইমন কুজনেটস্ এর গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান তা সমর্থন করে না।

৫. কৃষি, শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রস্টোর তত্ত্বে নেই।

তাত্ত্বিকভাবে যত মডেলই দেয়া হয়েছে, কোনো মডেলই সমালোচনা মুক্ত নয়। রস্টোর মডেলও এর ব্যতিক্রম নয়। কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অতীতে কী ছিল, বর্তমানে কী আছে, ভবিষ্যতে কী ধরনের হবে, সে সম্পর্কে তুলনামূলক চিত্র পাওয়ার জন্য রস্টোর মডেল গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করে।

রস্টোর উন্নয়নস্তর তত্ত্বে বাংলাদেশের অবস্থান : বাংলাদেশ বর্তমানে একটি উন্নয়নশীল নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। একটি স্বল্পোন্নত দেশের সকল বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশে বিদ্যমান। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিনির্ভরতা কিছুটা কমলেও এখনও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অবস্থান করছে। আবার উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মূলধন, সঞ্চয়-বিনিয়োগের ধনাত্মক প্রভাব কাজে লাগিয়ে শিল্পক্ষেত্রেও বেশ অগ্রগতি অর্জন করছে। সে হিসেবে রস্টোর ১ম ও ২য় স্তর আগেই অতিক্রম করেছে। আবার ৪র্থ স্তরে বাংলাদেশ এখনো পৌঁছাতে পারেনি। হয়তো দু'এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশ চতুর্থস্তর (সমৃদ্ধির দিকে যাত্রা) হয়ে ৫ম স্তরে পদার্পণ করবে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সূচক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় দেশটি Rostow এর ৩য় স্তর তথা উত্তরণ পর্বে অবস্থান করছে এ কথা বলা যায়। কেননা উত্তরণ পর্বের বৈশিষ্ট্য যেমন, দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন, নিশ্চলতার অবসান, প্রযুক্তি ও কৃৎকৌশলগত উন্নতি, কৃষি আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এসব বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা ও অর্থনীতিবিদরা মনে করেন।

সারসংক্ষেপ

অর্থনীতিবিদ W.W. Rostow তাঁর 'The Stage of Economic Growth' গ্রন্থে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নের পাঁচটি স্তর উল্লেখ করেছেন। এ পাঁচটি স্তর হলো যথাক্রমে–

ক. সনাতনী (চিরাচরিত) সমাজ–উন্নয়নের প্রথম স্তর/প্রাথমিক স্তর

খ. প্রাক্ উত্তরণ পর্ব/উত্তরণের পূর্ব অবস্থা–দ্বিতীয় স্তর

গ. উত্তরণ পর্ব–তৃতীয় স্তর

ঘ. পরিপক্বতা অর্জনের স্তর–চতুর্থ স্তর

ঙ. গণভোগের স্তর–পঞ্চম স্তর

পাঠ ১০.৭ উদ্বৃত্ত শ্রম সংক্রান্ত লুইস মডেল
Lewis Model of Surplus labour

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত শ্রম সংক্রান্ত লুইস মডেল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

ঙ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন/প্রবৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট লুইস মডেল (অথবা) উদ্বৃত্ত শ্রম সংক্রান্ত লুইস মডেল

Economic Development/Growth related Lewis Model (or) Lewis Model of Surplus Labour

অধ্যাপক W. Arther Lewis ১৯৫৪ সনে তাঁর 'Economic Development with Unlimited Supply of Labour' গ্রন্থে অনুন্নত দেশের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত যে মডেল প্রদান করেন, তাই বিখ্যাত 'লুইস মডেল' হিসেবে পরিচিত। লুইস-এর মতে, অনুন্নত অর্থনীতিতে জীবননির্বাহী খাত বা কৃষিখাত এবং পুঁজিবাদী খাত বা শিল্পখাত–এ দু'টি খাত বিদ্যমান। তিনি আরও মনে করেন, স্বল্পোন্নত দেশে জীবননির্বাহী খাতে যে উদ্বৃত্ত শ্রম থাকে তা পুঁজিবাদী খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়।

অনুমিত শর্তাবলি :

১. অর্থনীতিতে দু'টি খাত থাকবে। জীবননির্বাহী খাত এবং পুঁজিবাদী খাত।

২. জীবননির্বাহী খাতে শ্রমের মজুরি তার গড় উৎপাদনের সমান হয়।

৩. শ্রমিকের মজুরি স্থির থাকে।

৪. কৃষিখাত বা জীবননির্বাহী খাতে শ্রমের উদ্বৃত্ত থাকে যা পুঁজিবাদী খাতে স্থানান্তর যোগ্য।

৫. বদ্ধ অর্থনীতি বিবেচ্য।

৬. মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের জনসংখ্যার তুলনায় কম।

মডেলের বিশ্লেষণ : অধ্যাপক লুইস অর্থনীতিকে জীবননির্বাহী (কৃষি) এবং পুঁজিবাদী খাত (শিল্প) এ দু'খাতে বিভাজন করেছেন। তাঁর মতে, কৃষিখাতে পুনঃউৎপাদনযোগ্য মূলধন (Re-productible capital) ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু শিল্পখাতে তা ব্যবহারের সুযোগ আছে। আবার শিল্প বা পুঁজিবাদী খাতে শ্রমের মজুরি যা থাকে, কৃষি বা জীবননির্বাহী খাতে তার চেয়ে কম হয়। লুইস-এর মতে, জীবননির্বাহী খাতে বিদ্যমান মজুরি স্তরে শ্রমিকের যোগান শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা বেশি থাকে। এ অবস্থায় জীবননির্বাহী খাত হতে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের স্থানান্তর ঘটলেও গড় উৎপাদন হ্রাস পায় না। কাজেই উদ্বৃত্ত শ্রম পুঁজিবাদী খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে গড় উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিষয়টির সচিত্র ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

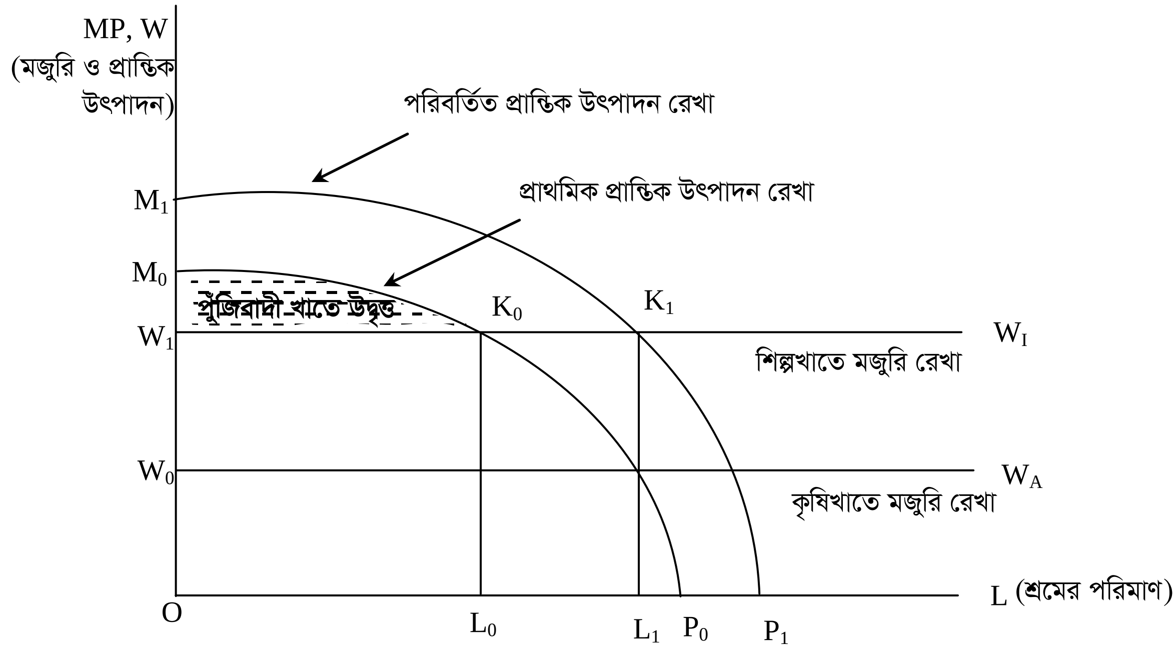

চিত্র ১০.৩ : উদ্বৃত্ত শ্রম সংক্রান্ত লুইস মডেল

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের পরিমাণ (L) এবং উলম্ব অক্ষে মজুরি (W) ও প্রান্তিক উৎপাদন (MP) দেখানো হলো। W_0W_A রেখাটি কৃষিখাতে মজুরি রেখা এবং W_1W_I হলো শিল্পখাতে মজুরি রেখা। কৃষিখাতে মজুরি হার কম বিধায় W_0W_A রেখাটির অবস্থান নিচে। M_0P_0 প্রাথমিক প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। OL_0 পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা পুঁজিবাদী/শিল্পখাতে উৎপাদন হয় $OL_0\ K_0\ M_0$ পরিমাণ, যখন মজুরির পরিমাণ $OL_0\ K_0\ W_1$। কাজেই শিল্পখাতে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়, যার পরিমাণ হলো $W_1\ K_0\ M_0$। আবার OL_0 শ্রম নিয়োগে কৃষিখাতে মজুরির পরিমাণ OW_0 এবং মজুরির পার্থক্য হলো W_0W_1 পরিমাণ। শিল্প খাতের $W_1\ K_0\ M_0$ পরিমাণ উদ্বৃত্তকে যদি পুনঃবিনিয়োগ করা যায় তাহলে পরিবর্তিত প্রান্তিক উৎপাদন রেখা হবে M_1P_1। এ অবস্থায় কৃষিখাত থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিক শিল্পখাতে নিয়োগ পায় যার পরিমাণ হলো L_0L_1 পরিমাণ।

এতে একই পরিমাণ মজুরিতে শিল্প খাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়বে যা চিত্রানুযায়ী $W_1K_1M_1$। এ বাড়তি উদ্বৃত্ত পুনঃবিনিয়োগ করার মাধ্যমে কৃষিখাত থেকে আরও শ্রমিক শিল্পখাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন/প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি করা যায়। এটিই লুইস (Lewis) মডেলের মূল কথা।

লুইস (Lewis) মডেল এর সমালোচনা/সীমাবদ্ধতা

১. অসীম শ্রমের যোগান ধারণাটি সবসময় সঠিক নয়। অনেক অনুন্নত দেশ আছে, যেসব দেশে শ্রমের সীমাবদ্ধতা আছে।

২. কৃষি উদ্বৃত্ত শ্রমিক বছর ব্যাপী থাকে না। কিছু কৃষি শ্রমিক মৌসুমি বেকারত্বের কবলে পড়ে।

৩. লুইস তাঁর মডেলটি শুরু করেছেন কৃষিকে গুরুত্ব দিয়ে। কিন্তু শেষদিকে পুঁজিবাদী বা শিল্পখাতকে অতি গুরুত্ব দেয়ায় জীবননির্বাহী বা কৃষিখাত উপেক্ষিত হয়েছে।

৪. আধুনিক অর্থনীতিতে শ্রমিকের দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশেষ করে শিল্পখাতে যে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন, তা কৃষিখাত থেকে স্থানান্তরের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়।

৫. লুইসের মডেলে পুঁজিবাদী খাতে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়ার পরও মজুরি স্থির ধরা হয়েছে, যা অবাস্তব।

৬. অর্থনীতিতে জীবননির্বাহী ও পুঁজিবাদী এ দু'খাত ছাড়াও অন্যান্য স্ব-নিয়োজিত খাত থাকতে পারে।

৭. আধুনিক অর্থনীতি বদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এখন অর্থনীতির অন্যতম হাতিয়ার।

লুইস মডেলের কিছু দুর্বলতা থাকলেও একথা সত্য যে, এ মডেলটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে একটি প্রয়োগযোগ্য মডেল হিসেবে বিবেচিত। বিশেষত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পুঁজি গঠন, জনসংখ্যা, কারিগরি উন্নতির প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে লুইস তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত শ্রম সংক্রান্ত লুইস মডেল : অধ্যাপক লুইস অর্থনীতিকে জীবননির্বাহী (কৃষি) এবং পুঁজিবাদী খাত (শিল্প) এ দু'খাতে বিভাজন করেন। তাঁর মতে, জীবননির্বাহী খাতে বিদ্যমান মজুরি স্তরে শ্রমিকের যোগান শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা বেশি থাকে। এ অবস্থায় জীবননির্বাহী খাত হতে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের স্থানান্তর ঘটলেও গড় উৎপাদন হ্রাস পায় না। কাজেই উদ্বৃত্ত শ্রম পুজিবাদী খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে গড় উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

পাঠ ১০.৮ বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির ধারা
The trend of growth in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির ধারা সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন,
- অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কৌশল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মূলপাঠ :

বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির ধারা

The trend of growth in Bangladesh

উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– কৃষিখাত, শিল্পখাত এবং সেবা খাত। বাংলাদেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ তিনটি খাতেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

(ক) GDP প্রবৃদ্ধি : সামষ্টিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়/জাতীয় উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক। GDP বা GNP বৃদ্ধির সাথে প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক ওতপ্রোতোভাবে জড়িত।

বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতি ও দেশীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হারকে থামিয়ে দিতে পারেনি। ২০০১–২০০২ অর্থবছরে বাংলাদেশের GDP প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৪ শতাংশ। ২০০২–০৩ সালে তা দাঁড়ায় ৫.২৬ শতাংশ। এভাবে বেড়ে তা ২০১১–১২ সালে তা হয় ৬.৫%। সর্বশেষ UNDP–2018 এর মতে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ৭.৬%। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বর্তমানে নিম্ন-মধ্য আয়ের বাংলাদেশ আগামী দশকে নিশ্চিত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। করোনার মধ্যেও মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিবিএসের সর্বশেষ হিসাবে ২০২০–২১ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৯৪ শতাংশ। সরকারের দেওয়া প্রণোদনা প্যাকেজ, প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয় বেড়ে যাওয়ার কারণে করোনার মধ্যেও প্রবৃদ্ধির ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

তবে COVID–19 অতিমারী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা চাপে পড়েছিল। এর প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও হুমকীতে ছিল। তবে সরকারের নানামুখী পৃষ্ঠপোষকতা এবং বেসরকারি খাতের সাফল্যের কারণে এ ক্ষতি সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

(খ) মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি : বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ৫০–৭০ মার্কিন ডলার যা ২০০০–০১ সালে ৩৭৪ মার্কিন ডলার, ২০১৬–১৭ সালে ১৬১০ মার্কিন ডলার এবং ২০২১–২২ সালে ১৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

(গ) GDP তে শিল্প, কৃষি ও সেবাখাতের অবদান : ২০০৯–১০ অর্থবছরে GDP তে কৃষিখাতের অবদান ২০.১৬%। শিল্প খাতের অবদান ২৯.৯৫% এবং সেবাখাতের অবদান ছিল ৪৯.৮৯%। খাতভিত্তিক এ অবদান World Development Report 2012 অনুসারে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৯%, ২৯% এবং ৫২%। ২০২০–২১ সালের হিসাব অনুযায়ী GDP তে খাতওয়ারি অবদান দেখা যায়, কৃষিখাত ১৩.৪৭%, শিল্পখাত ৩৪.৯৯% ও সেবাখাত ৫১.৫৩%।

(ঘ) GDP ভিত্তিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ : GDP তে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ খাতেও পরিবর্তনের ধারা সচল রয়েছে। ১৯৯৬–৯৭ সালে জাতীয় সঞ্চয় ছিল ১৪.৪%, ২০০৩–০৪ এ তা দাঁড়ায় ২৪.৪৯% এবং ২০০৯–১০ অর্থবছরে ২৯.৬৫% যা

২০২০–২১ (সাময়িক) হিসাব অনুযায়ী ৩০.৩৯%। অন্যদিকে GDP তে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৯৯৬–৯৭ সালে ১৭.৪%, ২০০৩–০৪ অর্থবছরে ২৩.৫৮%, ২০০৯–১০ সালে ২৪.৩৫% এবং সর্বশেষ ২০২০–২১ (সাময়িক) হিসাব অনুযায়ী, বিনিয়োগের পরিমাণ ২৯.৯২%।

উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

Economic Growth of developing and poor Countries

দরিদ্র দেশে অনুন্নত কৃষি, নিরক্ষর জনগণ, পুঁজির স্বল্পতা ইত্যাদি প্রতিনিয়ত দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খায়। অর্থনীতিবিদ নার্কসের মতে, কোনো দেশ দরিদ্র কারণ সে দেশে মূলধন অপ্রতুল বা কম। মূলধন কম কারণ সে দরিদ্র। অর্থাৎ একটি দেশ দরিদ্র কারণ সে দরিদ্র (A country is poor, because it is poor.) অধিকাংশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। স্বল্প মাথাপিছু আয়, স্বল্প সঞ্চয় ও স্বল্প বিনিয়োগ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অন্যতম প্রধান সমস্যা।

সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরিদ্রতা হ্রাস করে। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার বাড়লে দরিদ্রতা কমে যাবে এবং প্রবৃদ্ধির হার কমলে দরিদ্রতা বেড়ে যাবে। এ ব্যাপারে অবশ্য অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। এডাম স্মিথ তাঁর 'Wealth of Nations' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরিদ্রতা হ্রাস করে কি-না, তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। 'Growth and Poverty in Developing Countries.' নামক গ্রন্থে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ প্রবৃদ্ধি ও দরিদ্রতা বিষয়ে পর্যালোচনায় বলেন, যে সব দেশে প্রকৃত জাতীয় আয় সবচেয়ে কম সেসব দেশে দরিদ্রতার মাত্রা বেশি। অর্থাৎ দরিদ্রতা ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

তবে এটাও সত্য যে, দরিদ্রতা ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক সকল দেশে এরকম নয়। কিছু কিছু দেশে দরিদ্রতা ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক ধনাত্মক বা সমমুখী। অর্থনীতিবিদ M P Todaro তাঁর Economic Development in the third world, 1985 নিবন্ধে বিশ্বের ৩৬টি স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে এ অসামঞ্জস্যতা দেখতে পান। নির্বাচিত ১৩টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ৭টি দেশে যেমন– তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, শ্রীলঙ্কা, কলাম্বিয়া, কোস্টারিকা ও এলসালভাদর এ GNP বৃদ্ধির হার কম হলেও আয়ের বণ্টনে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে মেক্সিকো, পানামা, ভারত, পেরু এবং ফিলিপাইনে GNP প্রবৃদ্ধির হার কম হওয়াতে একই সময়ে আয় বণ্টনেও বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

রোমানীয়ান-আমেরিকান অর্থনীতিবিদ Irma Glicman Adelman এবং Morris তাঁদের Economic Growth and Social Equity in Developing Countries নামক বইতে ৪৩টি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দরিদ্রতার সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখেন যে, উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরিদ্রতাকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। আয় বৈষম্য বাড়িয়েছে এবং ধনীদের আরও ধনী বানিয়েছে।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Simon Kuznets অবশ্য উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবৃদ্ধি বাড়ার সাথে দরিদ্রতাও বাড়ে। কিন্তু একটা পর্যায়ের পর দরিদ্রতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য কুজনেটস এর এ বক্তব্য পাশ্চাত্যের উন্নত বিশ্বের জন্য সঠিক হলেও দরিদ্র, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জন্যে সঠিক নয়। কাজেই প্রবৃদ্ধি ও দরিদ্রতার সম্পর্ক মিশ্র ধরনের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধনাত্মক এবং আবার কখনও ঋণাত্মক। এ জন্যে অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, প্রবৃদ্ধি নয় বরং অর্থনৈতিক কাঠামোই আয় বণ্টনের প্রধান উপাদান ও নির্ধারক।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কৌশল

Strategies of Economic Planning

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। স্বল্পমেয়াদি প্রেক্ষিতে হলো বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Annual Development Plan) এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে হলো ৫–২০ বছর মেয়াদি বা তারও অধিক সময়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা। যেমন জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (United Nations Millennium Development Goals) এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) হলো ১৫

বছরের মধ্যে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা। বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালে ডেল্টা প্ল্যান–২১০০ (Bangladesh Delta Plan–BDP : 2100) একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনৈতিক মেগা প্ল্যান যা অর্থনীতির সমস্ত সেক্টরের পরিকল্পনা ও নীতিগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে একীভূত করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি পথ পরিকল্পনা চিত্রিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রথম ২০০৮ সালে দীর্ঘমেয়াদি বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ‘ভিশন ২০২১’ এবং পরবর্তীতে ‘ভিশন ২০৪১’ গ্রহণ করে। রূপকল্প ২০২১ হলো স্বাধীনতার বা বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর বছরে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া, কম-খরচে ইন্টারনেটে প্রবেশ এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রূপকল্প–২০৪১ হলো, এ সময়ের মধ্যে কৌশলগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, বাংলাদেশের লক্ষ্য শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের প্রসারকে উৎসাহ দেয়া এর উদ্দেশ্য।

উদাহরণ : দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা–

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG_s) হলো ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। জাতিসংঘ এগুলো প্রণয়ন করেছে এবং ‘টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা’ হিসেবে এগুলোকে প্রচার করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রতিস্থাপিত করেছে, যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। SDG_s-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৫–২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে UN Sustainable Development Summit এ বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানদের আলোচনার মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্মেলনের বিষয়বস্তু ‘Transforming our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development.’

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ :

২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ১৯৩টি দেশ নিম্নোক্ত ১৭ লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে একমত হয়েছে। এগুলো হলো–

১. দারিদ্র্যবিমোচন, ২. ক্ষুধা মুক্তি, ৩. সুস্বাস্থ্য, ৪. মানসম্মত শিক্ষা, ৫. লিঙ্গ সমতা, ৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ৭. নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানি, ৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি, ৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো, ১০. বৈষম্য হ্রাস, ১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়, ১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার, ১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ, ১৪. টেকসই মহাসাগর, ১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার, ১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান এবং ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা।

Ref: ‘The Global Goals for Sustainable Development’, Global Goals, সংগ্রহের তারিখ ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

সারসংক্ষেপ

উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– কৃষিখাত, শিল্পখাত এবং সেবা খাত। বাংলাদেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ তিনটি খাতেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

পাঠ ১০.৯ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
Eight Five Year Plan (2021–2025)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

Eight Five Year Plan (2021–2025)

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নয়নবান্ধব, দারিদ্র্যবিমোচন ও সবুজ প্রবৃদ্ধি সহায়ক বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। জনগণ ইতোমধ্যে সুফল পাচ্ছে বলা যায়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণাপত্রে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তা হলো–

● দক্ষতার উন্নয়নে বিনিয়োগ–কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ, অটোমেশন, রোবটিকস্ এবং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট (জনসংখ্যা সুবিধা) প্রভৃতির মাধ্যমে ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি। ● কর্মসংস্থান তৈরিতে প্রবৃদ্ধি ● উচ্চ প্রবৃদ্ধির সুবিধাগুলো সবার জন্য, সাম্য ও সমতা অর্জন অর্থাৎ সবার জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করা ● ২০৩০ সালের মধ্যে–(i) জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা, (ii) দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য হ্রাসের অগ্রগতির ধারা স্থিতিশীল রাখতে আরও নতুন কৌশল সৃষ্টি করা, (iii) কাঠামোগত পরিবর্তন এ অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কিছু সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করে সমাধানের ব্যবস্থা করা, (iv) আয় ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, (v) মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, (vi) স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ, (vii) নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে রপ্তানির বাজার বিস্তৃত করা, (viii) মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা আবশ্যক একই সাথে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করার গতিশীল উদ্যোগ গ্রহণ। তবে ২০২০ এর নোভেল করোনা ভাইরাস এর বিশ্বব্যাপী তাণ্ডব, ধ্বংসলীলার পর এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে সরকারি প্রণোদনার পাশাপাশি সরাসরি সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচুর ক্ষেত্র সৃজন, (ix) শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং), কৃষি এবং অনানুষ্ঠানিক সেবাখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ রয়েছে।

এ পরিকল্পনায় উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ কারিগরি শিক্ষা অর্জনের দ্বারা বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০–জুন ২০২৫)

স্লোগান/মূল সুর : শক্তিশালী ভূমি প্রশাসন গড়ে তোলা এবং দক্ষতার উন্নয়নের বিনিয়োগ। প্রধান তিনটি খাত :

১. কর্মসংস্থান তৈরিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি,

২. সবার জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করতে সাম্য ও সমতা এবং

৩. জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ হলো :

ক. দারিদ্র্যের হার ১২.১৭% এ নামিয়ে আনা বিনিয়োগ বেড়ে হবে মোট জিডিপির ৩৭.৪%;

খ. ২০২৪–২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.৫১% এবং মূল্যস্ফীতি ৪.৮% অর্জন;

গ. এক কোটি ষোল লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশের অভ্যন্তরে ৮১ লাখ ৭০ হাজার এবং প্রবাসে ৩৫ লাখ ধরা হয়েছে;

ঘ. ৭৭ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ যার ৭৬% বেসরকারি খাতের;

ঙ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কার্যক্রম শুরু করা;

চ. কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ঠ মহামারি থেকে পুনরুদ্ধারে স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় এবং অর্থনীতি কার্যক্রম পূর্বের ধারায় ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশলও ভিন্ন ধরনের রয়েছে। প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ হলো–(i) সনাতনী বা ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা, (ii) মুক্ত বাজারব্যবস্থা, (iii) কমান্ড/পরিকল্পিত ব্যবস্থা এবং (iv) মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এছাড়াও (v) ইসলামি অর্থ-ব্যবস্থা নামে একটি পৃথক উন্নয়ন কৌশল রয়েছে।

উন্নয়ন অর্থনীতির সনাতনী বিতর্কে কৃষি ও শিল্পের তুলনামূলক গুরুত্বের বিষয়ে আলোকপাত করে। কোনো দেশ বা অঞ্চল কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার, শিল্পের কাঁচামালের সংস্থান এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির চাকাকে অগ্রসর করতে চায়। আবার কেউ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্রুত উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

বাংলাদেশকে মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বর্গ হিসেবে উল্লেখ করেছে মার্কিন প্রভাবশালী সাময়িকী ফোর্বস (অক্টোবর ২০১৪)। মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের প্রকাশিত তথ্যানুসারে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থক। উক্ত জরিপে ৮০ শতাংশ বাংলাদেশি এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভালো বলে উল্লেখ করে। শীর্ষস্থানে থাকা ভিয়েতনামের ৯৫ শতাংশ মানুষ মুক্তবাজার ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এ তালিকায় বাংলাদেশের পরবর্তী তিনটি দেশ হলো যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও ঘানা। দক্ষিণ এশিয়ার আর কোনো দেশই বাংলাদেশের ধারে কাছে নেই। বাংলাদেশিরা মনে করে–মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো হয়, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয় এবং সর্বোপরি তা উচ্চ পারিশ্রমিকের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফোর্বস এর প্রতিবেদনের শেষে বলা হয়েছে, মুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে গত দু'দশকে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাতে ব্যাপক উন্নতি করেছে। শ্রমিক অসন্তোষ ও উন্নত কর্মপরিবেশের অভাব সত্ত্বেও এ খাতে ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে যার বেশিরভাগই নারী। এটিকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ফোর্বস এর প্রতিবেদনে।

কমান্ড/পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় উন্নয়ন পরিকল্পনার সবকিছুই উৎপাদন ও বণ্টনে রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে উদ্যোক্তার স্বাধীনতা নেই, ভোক্তারও সার্বভৌমত্ব নেই। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অনিশ্চয়তা, হতাশা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা নেই। বাজারব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত। শ্রেণিবৈষম্য এখানে উদ্ভব না হলেও শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টনের ফলে, সমাজে আয় বণ্টনে অসমতা বিদ্যমান। রাষ্ট্রের আঞ্চলিক উন্নয়নের মধ্যেও কোনো প্রকার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় না। সব অঞ্চলের সমানভাবে গুরুত্ব পায় বিধায় সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ ও সম্পদের মালিকানায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহঅবস্থান বিদ্যমান থাকে তাই বণ্টন ব্যবস্থায়ও উভয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব সজীব থাকে।

সবশেষে ইসলামি অর্থনীতি মানুষের প্রয়োজন অনুসারে উপার্জন, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবিক কল্যাণ সাধন এবং ন্যায়বিচার পূর্ণ সঠিক বণ্টন প্রণালিকে নির্দেশ করে। সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগ দখলে হালাল ও হারামের বিধান বাস্তবায়ন। এ অর্থনীতিতে মানবকল্যাণে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

সারসংক্ষেপ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০–জুন ২০২৫)

স্লোগান/মূল সুর : শক্তিশালী ভূমি প্রশাসন গড়ে তোলা এবং দক্ষতার উন্নয়নের বিনিয়োগ। প্রধান তিনটি খাত :

১. কর্মসংস্থান তৈরিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি,

২. সবার জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করতে সাম্য ও সমতা এবং

৩. জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা।

পাঠ ১০.১০ উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন ধারণাসমূহ
Different Concepts of Development Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য রচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা
Concept of Development Planning

পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণা বেশ পুরনো নয়। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) পূর্বে প্রবৃদ্ধি বা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কোনো দেশে প্রচলিত ছিল না। ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সে দেশে 'যুদ্ধাবস্থার সাম্যবাদ' (War Communism),[*] 'নতুন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা' (New Economic Policy)-এর পরীক্ষামূলক স্তর অতিক্রম করার পর ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীলনকশা প্রস্তুত করা হয় এবং ১৯২৮ সাল থেকে প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত 'পরিকল্পনা' বা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। এরপর এ ধারণা ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতিতেও বিকাশ লাভ করে।

যেকোনো অর্থনীতির বা তার কোনো অংশের উন্নয়ন নির্দেশক নীলনকশা (blue-prints) প্রণয়ন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর সম্ভাব্য বাস্তবায়নই হচ্ছে পরিকল্পনা। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ওপর রাষ্ট্রের পরিকল্পিত হস্তক্ষেপ গ্রহণ করাকে পরিকল্পনা বা উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেন।

অধ্যাপক ডিকেনসন-এর মতে, "বড় বড় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, কী দ্রব্য কত পরিমাণ উৎপন্ন হবে, কাদের মধ্যে বণ্টিত হবে– এসব বিষয়ে সমগ্র দেশের তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।" ("Economic planning is the making of major economic decisions what and how much to be produced and to whom it is to be allocated by the conscious decisions of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economic system as a whole." –H. D. Dickenson.)

---

* War Communism (যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ) : ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে ধর্মঘট ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার দরুন রাশিয়ার অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ে। মার্চ মাসে জার সম্রাটের ছোবল হতে রাশিয়া মুক্তি পায়। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি খোলাখুলিভাবে বিপ্লবাত্মক কার্যাবলি পরিচালনা করে। তখনও সোভিয়েট রাশিয়া কতিপয় বৈদেশিক চক্রের হস্তক্ষেপে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। একদিকে গৃহযুদ্ধ অপরদিকে শ্রমিক অসন্তোষ ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য নতুন বলশেভিক সরকারকে নীতি পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯১৭ হতে ১৯২১ সালের আগস্ট মাসের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ায় যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাই যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বা War Communism নামে অভিহিত। এর বৈশিষ্ট্য হলো : (i) সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ, (ii) কৃষকদের নিকট হতে খাদ্যসামগ্রী রিকুইজিশন (requisition), (iii) ব্যবসায়ে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ও দ্রব্যসামগ্রীর কেন্দ্রীয় বণ্টন এবং (iv) সর্বহারাদের একনায়কত্ব।

New Economic Policy (নতুন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা) : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সচলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশকে নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ১৯২১ সালের ৮ মার্চ সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে 'নতুন অর্থনৈতিক কার্যক্রম' অনুমোদন ও গ্রহণ করা হয়। এ নীতিমালা ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল এবং এটি ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শুভ উদ্বোধন। এ নীতিমালার মধ্যে ছিল– (i) বাধ্যতামূলক শস্য সংগ্রহ নীতি রহিতকরণ, (ii) কৃষি পরিবারের ব্যক্তিগত উৎসাহ ও উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে পূর্বাবস্থা প্রাপ্তির ব্যবস্থা, (iii) কৃষি দ্রব্যে অবাধ ব্যবসায় চালু, (iv) শিল্প প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, (v) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিজাতীয়করণ, (vi) মুদ্রা ও আর্থিক পদ্ধতির সংস্কার, (vii) সমবায়গুলোর বাণিজ্যিক স্বাধীনতা, (viii) ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবন এবং (ix) রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

অর্থনীতিবিদ মিসেস বারবারা উটন বলেন, "কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারসমূহ নির্বাচন করাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।" (Economic planning may be defined as the conscious and deliberate choice of economic priorities by some public authority." –Mrs. Barbara Wooton.)

অধ্যাপক হায়েক (Hayek)-এর মতে, "কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎপাদনশীল কার্যাবলির দিক নির্দেশনাই হলো পরিকল্পনা।" (Economic planning is the direction of productive activity by a central authority" –Prof. Hayek.)

প্রফেসর ডালটন (Prof. Dalton)-এর মতে, "ব্যাপক অর্থে ঈপ্সিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার নিমিত্তে অপ্রচুর সম্পদ ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতি বা নির্দেশকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।"

লুইস লর্ড উইন বলেন, "নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের আহরণযোগ্য সব উপকরণ ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে পৃথক উৎপাদন কেন্দ্রগুলো, উদ্যোগ ও শিল্পকে একটি সুসংহত কাঠামোর সহযোগী বিভিন্ন অংশে গণ্য করার চেষ্টাই হলো পরিকল্পনা।"

ওপরের সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে একটি **উত্তম উন্নয়ন পরিকল্পনার** জন্য নিম্নোক্ত **বৈশিষ্ট্যসমূহ** থাকা আবশ্যক।

১. সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় লক্ষ্য, উৎপাদন স্তর ও উন্নয়নের পর্যায় নির্ধারণ।

২. কত স্বল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভব, তার রূপরেখা প্রণয়ন।

৩. তুলনামূলকভাবে সর্বোচ্চ লাভজনক প্রকল্প নির্বাচন।

৪. সহজলভ্য ও মানসম্পন্ন উপকরণ ও তুলনামূলক দক্ষ এবং স্বল্পব্যয়ী উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন।

৫. সুনির্দিষ্ট, নিশ্চিত ও পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক অর্থায়নের উৎস।

৬. ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন চলমান রাখা।

অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন-পরিকল্পনা কমিশন, সঠিক ও পর্যাপ্ত পরিসংখ্যানিক তথ্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে target ঠিক করা, প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশ (Mobilisation of Resources), পরিকল্পনাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা (Balancing in the plan) দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ প্রশাসক, উপযুক্ত উন্নয়ন নীতি (Proper Development policy), মিতব্যয়িতা, উপযুক্ত শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প গ্রহণ, জনগণের ভোগ অভ্যাস এবং তাদের সহযোগিতা (Public Co-operation)।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, *একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতির অগ্রাধিকার বাছাইপূর্বক সুনির্দিষ্ট কতগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশে প্রাপ্ত সকল সম্পদের সুষ্ঠু, দক্ষ ও উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে যে নির্ধারিত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।*

উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

Types of Development Planning

বিশ্বের সবদেশেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এ কারণে বর্তমান যুগকে পরিকল্পনার যুগ বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যেমন : নির্দেশভিত্তিক বা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা; পুঁজিবাদী পরিকল্পনা; কেন্দ্রীয় ও বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা; কাঠামোগত ও আর্থিক পরিকল্পনা; সার্বিক ও আংশিক পরিকল্পনা; স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা।

উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নিম্নোক্তভাবে বিভাজন বা শ্রেণিবিন্যাস করা যায় :

উন্নয়ন পরিকল্পনা

- সম্পদ বণ্টনের প্রেক্ষিতে
- কার্যাবলি ও পরিধির প্রেক্ষিতে
- অঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে
- সময়ের প্রেক্ষিতে

এসব অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কতিপয় প্রকারভেদ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. সম্পদ বণ্টনের প্রেক্ষিতে (Based on Allocation of Resources) : সম্পদের বণ্টনের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. নির্দেশভিত্তিক বা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা (Command or Socialistic Planning) : নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনা, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এরূপ পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। দেশের সকল সম্পদ ও উপাদানের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃক সরাসরি সম্পদ সংগ্রহ করা যায়। ফলে সময় বা অর্থের কোনো প্রকার অপচয় এখানে সংঘটিত হয় না। এ পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত ফলাফল প্রদান করে।

তবে নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনায় অসুবিধা হলো এখানে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর কোনো প্রকার স্বাধীনতা নেই। সর্বাবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগের ভূমিকা শূন্য, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, চাহিদা ও যোগানের অসংগতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনমনীয়, জনগণের চাহিদার প্রতি কম গুরুত্ব প্রদান এবং প্রতিযোগিতা না থাকায় গুণগত মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদিত হয় না।

খ. প্ররোচিত বা পুঁজিবাদী পরিকল্পনা (Induced or Capitalistic Planning) : প্ররোচিত পরিকল্পনা, পুঁজিবাদী পরিকল্পনা বা বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা একই অর্থ প্রকাশ করে। এরূপ পরিকল্পনা পুঁজিবাদী বা গণতান্ত্রিক দেশসমূহে গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনায় উদ্যোক্তার স্বাধীনতা, ভোগকারীর স্বাধীনতা, বাজার প্রক্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত। তবে এ স্বাধীনতা অবাধ নয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর উদ্দেশে রাষ্ট্রকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। বাজার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার প্রয়োজনবোধে দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জনকল্যাণে প্রয়োজনবোধে ভর্তুকি প্রদান করে। মূলধনের গঠন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীকে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করে। উপযুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব নীতির মাধ্যমে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়কে নিরুৎসাহিত করে। এভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর তেমন কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করেই প্ররোচিত পরিকল্পনা দ্বারাও নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনার মতো অর্থনৈতিক সুফল লাভ করা যায়।

এ পরিকল্পনায় ক্রেতা ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর মধ্যে সহজে সমন্বয় হওয়ার কথা বলা হয়। বাজার চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলা হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের অভাবে, গবেষণার অভাবে বাজারে হয় অতি উৎপাদন সমস্যা অথবা কম উৎপাদন হয়ে থাকে। তাই এ অর্থনীতিতে বাণিজ্যচক্র, মুদ্রাস্ফীতি, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি, শোষণ, নির্যাতন বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কোনো একক পরিকল্পনার ওপর নির্ভর না করে নির্দেশভিত্তিক ও প্ররোচিত উভয়টির সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করা উচিত।

গ. কেন্দ্রীয় ও বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা (Centralised and Decentralised Planning) : যদি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়, তখন তাকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বলে। নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন এরূপ সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করে।

অন্যদিকে, যে পরিকল্পনায় অর্থনীতির প্রতিটি খাতের জন্য পৃথক পৃথক (যেমন–কৃষি, শিল্প-ক্ষুদ্রশিল্প, মাঝারিশিল্প ও বৃহৎশিল্প, এসএমই, সেবা, শিশু ও নারী উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন ...) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সরকারের আর্থিক নীতি ও

রাজস্বনীতির মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হয়, তাকে বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বলে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এ ধরনের পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়।

২. কার্যাবলি ও পরিধির ভিত্তিতে (Based on Terms of Coverage & Functions) : কার্যাবলি ও পরিধির প্রেক্ষিতে এ ধরনের পরিকল্পনা কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন−

ক. বস্তুগত ও আর্থিক পরিকল্পনা (Physical and Financial Planning) : যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোন খাতে কী পরিমাণ উৎপাদন করা হবে অর্থাৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের উৎস ও সংস্থান বা যোগান প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়, তাকে বস্তুগত পরিকল্পনা বলে। এরূপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে দেশে আয় ও কর্মসংস্থান সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে।

আবার, যে পরিকল্পনায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনীতির প্রত্যেকটি খাতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বা চাহিদা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণের বণ্টন অর্থমূল্যে প্রকাশ করা হয়, তাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয়-লাভ বিশ্লেষণ করা হয়।

খ. কাঠামোগত ও কার্যগত পরিকল্পনা (Structural & Functional Plan) : আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক এসবের পরিবর্তনকে বিবেচনায় রেখে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে কাঠামোগত পরিকল্পনা বলে। এর ফলে সমাজে আয়-বৈষম্য, জাতিগত ভেদাভেদ ইত্যাদির পরিবর্তন সূচিত হয়।

পক্ষান্তরে, দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অপরিবর্তিত রেখে যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে কার্যগত পরিকল্পনা বলে।

গ. সংশোধিত ও উন্নয়ন পরিকল্পনা (Corrective & Development Planning) : অর্থনীতির বিদ্যমান কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে তা সমন্বয়ের উদ্দেশে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে সংশোধিত পরিকল্পনা বলে। যেমন : অর্থনীতিতে যদি কখনো মুদ্রাস্ফীতির চাপ অনুভূত হয়, তখন সরকার তা দূর করার লক্ষ্যে সংশোধিত আর্থিক নীতি, রাজস্বনীতি ঘোষণা করে। করের হার বৃদ্ধি করে, ভোগ, বিনিয়োগ এবং সরকারি ব্যয় হ্রাস পায়।

আবার, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের একই সাথে সামগ্রিক অর্থনীতির পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

ঘ. সার্বিক ও আংশিক পরিকল্পনা (Comprehensive and Partial Planning) : যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অর্থনীতির বিভিন্ন অংশ বা খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি মাত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে সার্বিক পরিকল্পনা বলে।

পক্ষান্তরে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দেশের সকল খাত অন্তর্ভুক্ত নয়, কোনো বিশেষ খাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে আংশিক পরিকল্পনা বলে।

৩. অঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে (Based on Region) : অঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন−স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা (Local, Regional, National and International Planning)। কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় তাকে **স্থানীয়** পরিকল্পনা বলে। যেমন : হাওর এলাকার কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা।

অন্যদিকে, কোনো দেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়, তাকে **আঞ্চলিক** পরিকল্পনা বলে। যেমন : উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা দূরীকরণের পরিকল্পনা; দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত সহিষ্ণু কৃষি চাষাবাদ প্রকল্প।

পক্ষান্তরে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে **জাতীয়** পরিকল্পনা বলে। যেমন : বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পরিকল্পনা।

আবার, কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে একাধিক দেশের স্বার্থে বা বৈশ্বিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে **আন্তর্জাতিক** পরিকল্পনা বলে। যেমন : বৈশ্বিক মন্দা দূরীকরণে সামষ্টিক উদ্যোগ; জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাসে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

৪. সময়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Planning According to Time Period) : পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় মেয়াদের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা তিন প্রকার। যথা :

(ক) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Long term Perspective Plan) → ১০–২৫ বছর মেয়াদি

(খ) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (Medium term Plan) → ৫ বছর অপেক্ষা অধিক কিন্তু দশ বছর অপেক্ষা কম

(গ) স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Short term Planning or Annual Development Plan)

ক. প্রেক্ষিত বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

Long term Perspective Planning

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বিরামহীন গতিতে সর্বদা চলমান। তাই দীর্ঘমেয়াদি বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুন্নত দেশসমূহে সর্বাধিক জনপ্রিয়।

সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে যেমন ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। তাই বলে এ দীর্ঘ সময়ের জন্য শুধু একটি পরিকল্পনা বোঝায় না বরং এ সময় ব্যাপ্তির মধ্যে খণ্ডকালীন পরিকল্পনাগুলোকে পৃথক পৃথক পরিকল্পনারূপে চিহ্নিত করা হয় যা কোনো অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন নয়। কেননা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোর অন্তরালে বিস্তৃত কোনো পটভূমি বা সুদূরপ্রসারী কোনো আদর্শ বা নীতি বিদ্যমান থাকে। সুদূরপ্রসারী কোনো বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে ভেঙে মধ্যমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় অনেক বেশি নিখুঁত ও বাস্তবতার নিরিখে কার্যকর করা যায়। এজন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোকে ভেঙে বার্ষিক পরিকল্পনায় রূপান্তর করা ছাড়াও বিভিন্ন খাতওয়ারি (Sectoral), উপ-খাতওয়ারি (Subsectoral) এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনাগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পটভূমিতে রচনা করা হয়।

উদ্দেশ্য : দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হলো :

১. স্বল্পকালীন পরিকল্পনাগুলোর পটভূমি সমুন্নত রাখার সাথে সাথে দীর্ঘকালীন সমস্যাগুলোর সমাধান করার বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করাই হচ্ছে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।

২. উন্নয়নশীল দেশসমূহের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুত কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, প্রকৃত আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

৩. দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দেশ সামগ্রিক ভারসাম্যে উপনীত হতে সচেষ্ট থাকে।

৪. দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, কৌশলিক এবং কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি সামাজিক স্থায়ী মূলধন লাভের যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন।

৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা দূরীকরণে জনসংখ্যারোধক সুদূরপ্রসারী কার্যাবলির সফল বাস্তবায়ন।

৬. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করা।

৮. যেকোনো দেশের অর্থব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা দূর করে উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা।

৯. দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার পটভূমিতে প্রণীত স্বল্পকালীন পরিকল্পনার কোনো ক্ষেত্রে যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যকোনো কারণে ব্যর্থতা দেখা দেয় তবে তা পরবর্তী সময়ে পূরণ করা।

নিম্নের প্রবাহ চিত্রে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দেখানো হলো :

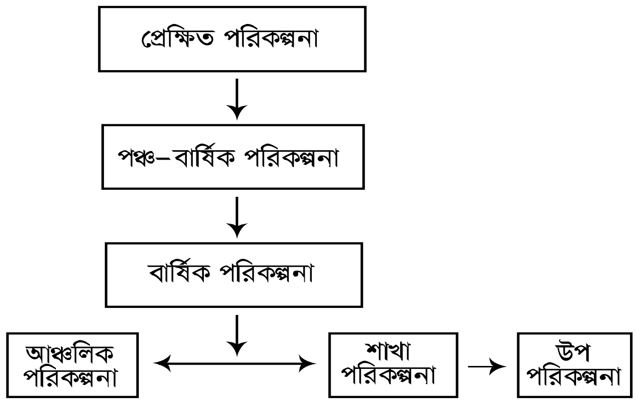

উদাহরণ : বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০১০–২০২১, ২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান–২১০০ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে। রূপকল্প–২০২১ এর লক্ষ্য ছিল :

১. ধর্মনিরপেক্ষ, উদার প্রগতিশীল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন;
২. দ্রুত দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস;
৩. নিরাপদ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ,
৪. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সমস্যার উন্নয়ন, যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন;
৫. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
৬. বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা–মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি দক্ষতার সাথে মোকাবেলা;
৭. পরিবেশবান্ধব, টেকসই উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন;
৮. দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা;
৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন;
১০. মধ্যম শ্রেণির আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রভৃতি।

উচ্চ আয়ের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১–২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত MDG ও SDG হলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

রূপকল্প ২০৪১ : বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা : ২০২১–২০৪১

লক্ষ্য : ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশে উন্নীত হবে। বর্তমান বাজার দামে তখন মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে ১২৫০০ মার্কিন ডলার। উচ্চতর আয়ের সুফল সর্বজনীন করা, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। বাংলাদেশের উন্নয়নের পদচিহ্ন–

২০২০ সাল	২০৩০ সাল	২০৪১ সাল
হতদরিদ্র বর্তমানে ৯.৩৮%	হতদরিদ্র নির্মূল হবে (৩% নামলে নির্মূল বলা হয়)	হতদরিদ্র হার কমে ০.৬৮% হবে
জিডিপি প্রবৃদ্ধি বর্তমানে ৮.১৯%		GDP প্রবৃদ্ধি হবে ৯.৯%
মোট বিনিয়োগ GDP এর ৩২.৭৬%	GDP এর ৪০.৬০%	GDP এর ৪৬.৮৮%
মোট রাজস্বের পরিমাণ GDP এর ১০.৪৭%	১৯.০৬%	২৪.১৫%
দেশের মোট জনসংখ্যা		● ২১ কোটি ● গড় আয়ু ৮০ বছর ● জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১% ● রাজস্ব কর জিডিপির ১৫% পর্যন্ত বাড়ানো। ● রপ্তানি আয় ৩০০ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি করা। ● মোট জনসংখ্যার ৭৫% কে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। ● কার্যকর কর এবং ব্যয়ের নীতিমালা কার্যকর করা এবং ● অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ।
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২৪		৪

দারিদ্র্য নিরসনে মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতার হার শত ভাগ, ১২ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্যবিমা স্কিম নিশ্চিত করতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

—সূত্র : পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (GED) তৈরি প্রতিবেদন : NEC সভার জন্য। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

* নভেল করোনা ভাইরাস COVID–19 উত্তর 'মহামন্দার' কারণে এবং ইউরোপে যুদ্ধের ফলে পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকবে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ভোগ্যদ্রব্য, আয়, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির আলোকে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারণ করার জন্য অনুন্নত দেশসমূহে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বিশেষভাবে সমাদৃত। কারণ অনুন্নত দেশসমূহের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো সৃষ্টি অত্যাবশ্যক। মোটকথা, সঞ্চয়-বিনিয়োগ, আয়-কর্মসংস্থান ইত্যাদির গতিহীনতা দূরীকরণসহ বহুবিধ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে একটি সর্বরোগ নিরোধক উপায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

খ. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা

Medium term plan

প্রেক্ষিত বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে ভেঙ্গে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় রূপান্তর করা হয়। এরূপ পরিকল্পনায় সময়সীমা পাঁচ বছর অপেক্ষা বেশি দশ বছর অপেক্ষা কম ধরা হয়। সাধারণত পাঁচ বছর সময়কালকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে নির্দেশ করা হয়। দুটি বা তার অধিক মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার সমন্বয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রচিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে ধরা যায়। এক্ষেত্রে একটি মধ্যমেয়াদি বা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকে ভেঙ্গে স্বল্পমেয়াদি বা পাঁচটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় রূপান্তর করা হয়। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো হলো

ব্রিজ বা সংযোগস্থল। দীর্ঘমেয়াদি কোনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তার খণ্ডাংশ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন আবশ্যক। আবার মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য : মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

১. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ দূর করা;

২. পূর্বে পরিকল্পনায় বাদ পড়া কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি মূল পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা;

৩. সময়ের প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কৌশল এবং লক্ষ্যমাত্রায় পরিবর্তন সাধন;

৪. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে কি-না তা অনুধাবন বা মূল্যায়ন করা;

৫. কৃষি, রাজস্ব আহরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য হ্রাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে টেকসই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা;

৬. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অনিশ্চয়তা দূরীকরণ এবং

৭. দেশীয় ও বৈদেশিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

গ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা

Short term Planning

উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে বহুমুখী লক্ষ্য ও কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে। এরূপ স্বল্প সময়সীমার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

অতএব বলা যায়, স্বল্পমেয়াদি কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

উদ্দেশ্য : স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

২. বিশেষ কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩. অর্থনীতির প্রতিটি খাত এর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পদচিহ্নের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন।

৪. মেয়াদভিত্তিক বা নির্দিষ্ট সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অনিশ্চয়তা হ্রাস।

৬. উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ ত্বরান্বিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮. পরবর্তী পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন।

সুবিধাসমূহ :

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

১. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কী অর্জন করতে হবে, পরবর্তীতে কী করতে হবে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়।

২. এ পরিকল্পনা নিখুঁত ও বিশদভাবে প্রস্তুত করা যায়।

৩. উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।

৪. অধিকতর প্রয়োজনীয় সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়া সম্ভব।

৫. এ ধরনের পরিকল্পনায় তুলনামূলক কম মূলধনের প্রয়োজন হয়।

এ সকল সুবিধার কারণে বর্তমানে অধিকাংশ দেশ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে অধিকতর আগ্রহী।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে এক একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কাঠামো গঠন করে। অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার সঠিক মেয়াদ বা সময়সীমা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য

Differences between Short and Long term Planning

স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

পার্থক্যের বিষয়	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
১. সংজ্ঞা	স্বল্প সময়সীমার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।	দীর্ঘমেয়াদ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।
২. সময়	সাধারণত এরূপ পরিকল্পনার সময় এক বছর পর্যন্ত হতে পারে।	পক্ষান্তরে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময় ১০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে।
৩. উদ্দেশ্য	এ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির সফলতা-ব্যর্থতা মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো কোনো দেশের অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা দূর করে টেকসই উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা।
৪. উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা সহজ নয়।	অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাহায্যে গ্রহণ করা অতি সহজ।
৫. ব্যবহৃত সম্পদের পরিমাণ	এখানে তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন হয়।	এখানে তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন হয়।
৬. বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অধীনে যেসব সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও প্রকল্প নির্ধারণ করা হয়, সেগুলোর যথাযথ পরিসমাপ্তির মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটে।	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটে।
৭. ভূমিকা	অর্থনৈতিকভাবে কম কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণে সহায়ক।	এ পরিকল্পনা অর্থনৈতিকভাবে অধিক কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণে সহায়ক।
৮. স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা একটি অস্থায়ী পরিকল্পনা। এর মধ্যে অর্থনৈতিক অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত থাকতে পারে।	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভেতর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের স্থায়িত্ব, অস্তিত্ব, সঠিক কর্ম দক্ষতা ও দিক নির্দেশনা থাকে।

পার্থক্যের বিষয়	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
৯. ক্ষুদ্র স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ভেতর ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম।	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জাতীয় স্বার্থ ক্ষুদ্র স্বার্থ অপেক্ষা অগ্রাধিকার পায়।
১০. প্রয়োগক্ষেত্র	সাময়িক পরিস্থিতি, যেমন–প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, বাঁধ ভেঙ্গে কৃষিভূমি প্লাবিত, খাদ্য সংকট, সর্বোচ্চ বার্ষিক বাজেট।	কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান এর জন্য এরূপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যেমন–বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ, সাগর পাড়ের সবুজ বেষ্টনী নির্মাণ, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা-চট্টগ্রাম ফোর লেইন বা ডবল রেল লাইন প্রকল্প।
১১. সার্বিক উন্নয়ন	এ পরিকল্পনায় সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয় না।	এ পরিকল্পনায় টেকসই, কাঠামোগত সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

ওপরের পার্থক্য থেকে বলা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা জাতীয় উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের জন্য যেমন সহজ ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার দ্বারা তা করা সম্ভব হয় না। তবে **ড. হেনস রাজ**-এর মতে, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও তার মূল্যায়নের দিক থেকে সবচেয়ে আদর্শ পরিকল্পনা হচ্ছে 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'। বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ এ সময় মেয়াদের পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

Annual Development Plan/Programme (ADP)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। এক বছর সময়সীমার মধ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাধীন কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু দক্ষ ব্যবহারকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (ADP) বলে। এরূপ ADP বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পর্যায়ক্রমে, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করে।

উদ্দেশ্য : বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

১. আর্থ-সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন,
২. কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন,
৩. কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি,
৪. শিক্ষার প্রসার,
৫. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ,
৬. জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি,
৭. সরকারি-বেসরকারি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি,
৮. যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন,
৯. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ,
১০. স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ দূরীকরণ।

ওপরের আলোচনা হতে বোঝা যায়, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এরূপ কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে এক বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। এভাবে ক্রমাগত ADP বাস্তবায়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জন সম্ভব হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, সবার জন্য বিদ্যুৎ এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমানে এডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এছাড়া আরও কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন :

ক. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা (Rolling plan) : পরিকল্পনার কার্যাবলি এবং সময়সীমা যখন অবিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা হয় তখন তাকে ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা বলে।

অধ্যাপক Myrdal প্রথম অর্থনীতিবিদ যিনি Indian Economic Planning এ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে এ পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করেন।

এ পরিকল্পনায় প্রতি বছর তিনটি নতুন পরিকল্পনা প্রতিস্থাপিত হয়। প্রথমটি চলতি বছরের জাতীয় বাজেট এবং বৈদেশিক বিনিময় বাজেট সংক্রান্ত। দ্বিতীয়টি ৫, ৬ বা ৭ বছর মেয়াদে কোনো মধ্যমেয়াদি লক্ষ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এবং তৃতীয়টি দীর্ঘমেয়াদি কোনো লক্ষ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

খ. স্থির পরিকল্পনা (Fixed Plan) : ৪–৭ বছর মেয়াদি কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। যেমন : দীর্ঘদিন যাবৎ রাশিয়া ও ভারত এ পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। রাশিয়ান পরিকল্পনার সময় মেয়াদ ৭ বছর যেখানে ভারতে এ পরিকল্পনার সময় মেয়াদ ৫ বছর।

সারসংক্ষেপ

উন্নয়ন পরিকল্পনা : একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতির অগ্রাধিকার বাছাইপূর্বক সুনির্দিষ্ট কতগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশে প্রাপ্ত সকল সম্পদের সুষ্ঠু, দক্ষ ও উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে যে নির্ধারিত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

প্রেক্ষিত বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা : সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে যেমন ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে।

মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা : প্রেক্ষিত বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে ভেঙে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় রূপান্তর করা হয়। এরূপ পরিকল্পনার সময়সীমা পাঁচ বছর অপেক্ষা বেশি দশ বছর অপেক্ষা কম ধরা হয়।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা : স্বল্পমেয়াদি কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এরূপ পরিকল্পনায় সময়সীমা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (ADP) : এক বছর সময়সীমার মধ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাধীন কতগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু দক্ষ ব্যবহারকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Annual Development Plan) বলে।

পাঠ ১০.১১ উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ও অভিজ্ঞতা
Importance of Development Planning and Experience

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন,
- বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার সার-সংক্ষেপ জানতে পারবেন,
- ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন,
- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যাসমূহ জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব
Importance of Development Planning in Developing Countries

একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট দেশটির জন্য সবচেয়ে বেশি কাম্য উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে। পরিকল্পনা এক অর্থে ভবিষ্যৎ দর্শন। "কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করে সামাজিক সম্পদসমূহের যথোপযুক্ত বিলি-বণ্টন ও ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত সুনির্দিষ্ট সংস্থা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপকতম সমীক্ষা এবং উপযুক্ত চিন্তা ও বিবেচনার পর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণই হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।"–Dickenson.

প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো জনগণের অর্থনৈতিক অভাব-মোচন করা এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। যেকোনো সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনগণের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য কর্মসূচি গৃহীত হয়। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহকে বিকাশমান কোনো দেশের পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে–

১. **আধুনিক যুগ পরিকল্পনার যুগ :** পরিকল্পনা ব্যতীত অর্থনীতির অব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগানো যায় না। পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন, আয়, নিয়োগ, বেসরকারি ভোগ ও বিনিয়োগ প্রবণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

২. **জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর :** বাংলাদেশের মতো জনসংখ্যাবহুল অর্থনীতির জন্য পরিকল্পিত উপায়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যার গুণগত মান উন্নয়ন, তাদেরকে কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের দ্বারা অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

৩. **কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :** দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হলো সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠির সূচক। কারণ দেশের সকল খাতের উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত শ্রম ও জনশক্তিকে পরিকল্পিতভাবে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কোনো বিকল্প নেই।

৪. **মূলধন গঠন :** স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ঈপ্সিত উন্নয়নের জন্য দ্রুত মূলধন গঠন জরুরি। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভোগ ব্যয় হ্রাস করে ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করা যায়।

৫. **সম্পদের কাম্য ব্যবহার :** সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পিতভাবে সম্পদের কাম্য ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৬. **আয় বৈষম্য হ্রাস :** জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও তার সুষ্ঠু ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে আয় বৈষম্য হ্রাসে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য।

৭. **নিয়োগস্তর বৃদ্ধি :** বাংলাদেশসহ অন্যান্য কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে প্রকট বেকার সমস্যা বিদ্যমান। বিনিয়োগের স্বল্পতাই এ বেকারত্বের মূল কারণ। তাই পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে দেশে নিয়োগস্তর বৃদ্ধি পাবে তথা বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে।

৮. **প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :** সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আবশ্যক। দেশের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের দক্ষ ব্যবহার অপরিহার্য।

৯. **খাদ্য ঘাটতি পূরণ :** অনুন্নত দেশে স্বল্প উৎপাদনের জন্য খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, ফলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়। বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

১০. **কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন :** সীমাবদ্ধ সম্পদের সাহায্যে স্বল্প সময়ে দেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। এখানে শুধু কৃষি অথবা শিল্পের একক উন্নয়ন দ্বারা দেশের দ্রুত উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। প্রয়োজন উভয় খাতের সুসমন্বিত উদ্যোগ ও উন্নয়ন।

১১. **সুষম উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের সকল অঞ্চলের লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেরই সুষম উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এজন্য সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

১২. **লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর :** দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অধিক আমদানি ব্যয়ের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের যে প্রতিকূলতা দেখা দেয় তা পরিকল্পিত উপায়ে আমদানি বিকল্প-রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করা সম্ভব।

১৩. **মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস :** অব্যাহত উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে। পরিকল্পিত আর্থিক ও মুদ্রাব্যবস্থার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেগবান রাখা সম্ভব।

১৪. **একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ :** অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবার দ্রুত প্রসার লাভ করে। শুধুমাত্র পরিকল্পিত অর্থনীতিতেই একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব রোধ এবং কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব।

১৫. **বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস :** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

১৬. **মিশ্র অর্থনীতির বিকাশ :** বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান তথা মিশ্র অর্থনীতি বিদ্যমান, যার বিকাশ সাধনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন।

১৭. **বেকার সমস্যার সমাধান :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করার জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক।

১৮. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন :** অর্থনীতিতে অতি উৎপাদন বা কম উৎপাদন উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করে। এরূপ সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পিত উপায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা অতি জরুরি ও যৌক্তিকতা রয়েছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে সচেষ্ট প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। সুষ্ঠু ও কার্যকর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই স্বল্পতম সময়ে দেশীয় ও বৈদেশিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যাশিত উন্নয়ন সম্ভব।

বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার সার-সংক্ষেপ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩–৭৮) : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে প্রণয়ন করলেও পরিকল্পনার শেষ বছরে সফলতা সেরূপ অর্জিত হয়নি।

লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫ ভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ৬০ ভাগ, বৈদেশিক সম্পদ নির্ভরতা ৪০ ভাগ এবং সঞ্চয় আহরণ হবে ১৫.২ ভাগ। কিন্তু পরিকল্পনা শেষে অর্জিত হয়েছে প্রবৃদ্ধির হার ৪ ভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ২৩ ভাগ, বৈদেশিক সম্পদ নির্ভরতা ৭৭ ভাগ এবং সঞ্চয় আহরণ হয়েছে জিডিপির ৩.৯ ভাগ। এ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দের ৪৬.৫৫ ভাগ, গণখাতের ৪১.৩৭ ভাগ এবং ব্যক্তিখাতে ৮৭.২৮ ভাগ ব্যয়িত হয়।

লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও আয় বণ্টনের অসমতা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা ও নিরক্ষরতা কিছুই হ্রাস পায়নি।

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮–৮০) : এ পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল GDP প্রবৃদ্ধির হার ৫.৬০ ভাগ, কৃষি উৎপাদন ৪.১ ভাগ ও শিল্প উৎপাদন ৭.৩ ভাগ বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ২.৮ ভাগ হারে বৃদ্ধি, ২৩ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা ৭৭ ভাগ হতে ৬৪ ভাগে হ্রাস করা, খাদ্য আমদানির পরিমাণ ১৭ লক্ষ টন হতে ১৩ লক্ষ টনে হ্রাস করা এবং রপ্তানি আয় ১১ ভাগ হারে বৃদ্ধি করা।

কিন্তু অর্জন হতাশাজনক। এ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দের ৮৭ ভাগ, গণখাতে ৭৩.৬৬ ভাগ এবং ব্যক্তিখাতে ১৫৯.৫০ ভাগ ব্যয়িত হয়। অর্জিত হয়েছে প্রবৃদ্ধির হার ৩.৫০ ভাগ, খাদ্য আমদানির পরিমাণ ২৯.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পরিকল্পনাটা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০–৮৫) : এ পরিকল্পনায় GDP প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৪ ভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ০৬ ভাগ, বৈদেশিক সম্পদের ওপর নির্ভরতা ৯৪ ভাগ। কিন্তু অর্জিত হয়েছে প্রবৃদ্ধি ৩.৮ ভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ৩৯ ভাগ, বৈদেশিক সম্পদ নির্ভরতা ছিল ৬১ ভাগ। এ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দের ৮৮.৯৪ ভাগ, গণখাতের ৯৩.০৫ ভাগ এবং ব্যক্তিখাতে ৮১.৪৬ ভাগ ব্যয়িত হয়। আয় বণ্টনের অসমতা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা, নিরক্ষরতা এসব হ্রাসের উদ্যোগ তেমন সফল হয়নি।

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫–৯০) : GDP প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৪ ভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ৪৫.৫২ ভাগ, বৈদেশিক সম্পদ নির্ভরতা ৫৪.৪৮ ভাগ। কিন্তু অর্জিত হয়েছে প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮ ভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ১০ ভাগ, বৈদেশিক সম্পদ নির্ভরতা ৯০ ভাগ। এ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দের ৬৯.৯৮ ভাগ, গণখাতে ৬৮.৫২ ভাগ এবং ব্যক্তিখাতে ৭২.৬৬ ভাগ ব্যয়িত হয়। এছাড়া অর্থনীতির অন্যান্য খাতেও আশানুরূপ কোনো পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০–৯৫) : লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় GDP প্রবৃদ্ধির হার ৫.০ ভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ৪৮ ভাগ, বৈদেশিক সম্পদ নির্ভরতা ৫২ ভাগ। কিন্তু অর্জিত হয়েছে প্রবৃদ্ধির হার ৪.১৫ ভাগ। এ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দের ৯৬.৫৩ ভাগ, গণখাতে ৭৮.৯৯ ভাগ এবং ব্যক্তিখাতে ১১৮.৮৩ ভাগ ব্যয়িত হয়। পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পায়নি, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। সঞ্চয়, বিনিয়োগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন কোনোটিই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭–২০০২) : GDP প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয় ৭.০০ ভাগ, অর্জিত হয় ৫.২১ ভাগ, সম্পদ বণ্টন তথা মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে মাত্র ৭০.১০ ভাগ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ এ পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দের ৭০.১০ ভাগ; গণখাতে ৭৩.৯৭ ভাগ এবং ব্যক্তিখাতে ৬৭.০৮ ভাগ ব্যয়িত হয়। এছাড়া মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সঞ্চয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আশানুরূপ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

২০০২ সালের ৩০ জুন সমাপ্তকৃত এ পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার এসব ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এরূপ অবস্থায় সরকার পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংক-এর সহায়তায় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তে 'ত্রি-বার্ষিক দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র' প্রণয়ন করে।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

Experience of Sixth Five Year Plan

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১–২০১৫) ও অন্যান্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতোই পরিপূর্ণভাবে সফলতা অর্জন করতে না পারলেও–এ পরিকল্পনার বিশেষত্ব হলো অধিকাংশ সূচকই সাফল্যের নিকটে পৌঁছেছে, যা এর পূর্বে হয়নি। তবে এ ব্যর্থতার জন্য রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকেই দায়ী করা হয়।

সাফল্য : (i) প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

(ii) মূল্যস্ফীতি ৬% এর মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তা অর্জিত হয়েছে।

(iii) এ পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ৮০০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি করার লক্ষ্য ছিল, তা অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ ৭১% এ উন্নীত হয়ে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার বেড়েছে সন্তোষজনক।

(iv) জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয়নি যেসব ক্ষেত্রে :

(i) মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। পরিকল্পনার শেষ বছরে GDP প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮%, অর্জিত হয়েছে মাত্র ৬.৬%।

(ii) মোট কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ কোটি ৪ লাখ, অথচ অর্জিত হয়েছে ৬২ লাখ। ৪২ লাখ কর্মসংস্থান দিতে পারেনি।

(iii) ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ যতটা বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা ছিল GDP এর ২৫%, হয়েছে ২২% অর্থাৎ তা অর্জিত হয়নি। লক্ষ্যমাত্রা ছিল GDP এর ৬%, অথচ অর্জিত হয়েছে ৫% এর কম। এক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ঘাটতি ছিল যথেষ্ট।

(iv) কৃষি প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশিত ছিল GDP এর ৪.৩% অথচ অর্জিত হয়েছে ৩.৩%।

(v) দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনতে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় GDP এর ৩% করার লক্ষ্য ছিল, অথচ এখাতে ব্যয় হয়েছে GDP এর ২.২%। দেশে এখনো ৩ কোটির অধিক লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে।

(vi) শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও অর্জিত হয়নি।

(vii) আদালতে মামলার জট কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ লাখ, অথচ মামলা না কমে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩১ লাখ।

(viii) রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধিও সাফল্য পায়নি। রাজস্ব জিডিপি অনুপাত ১২.৫০% হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, অথচ তা হয়েছে ৯%। আয়কর দেওয়ার সংখ্যাও ছিল কম।

(ix) প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ব্যবহার করার জন্য ৫০০০ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল, অথচ নির্মাণ করা হয়েছে ৪০০০টি।

(x) সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ৩৩% এ উন্নীত করার লক্ষ্য থাকলেও, অর্জিত হয়েছে ২৫%।

(xi) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে সারাদেশে বনাঞ্চল বাড়ানোর যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাও বাস্তবায়ন হয়নি।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

Experience of Seventh Five Year Plan

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬–২০২০) এ সময়টা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এসময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত স্থিতিশীল ছিল। বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ, উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪০ সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশের তালিকায় গর্বিত অংশীদার হতে পারবে। তবে এ পথ একেবারে মসৃণ নয়, বাধা আছে। যেমন : (i)

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা, (ii) ২০২০ সালের বিশ্বব্যাপী নভেল করোনা ভাইরাসের মহামারি এবং মহামন্দার প্রভাব সাফল্যজনকভাবে কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ, (iii) সুশাসন নিশ্চিতের পাশাপাশি দুর্নীতির মনোভাবকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা, (iv) বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়ন এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতিমুক্ত যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির চ্যালেঞ্জ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও সকল লক্ষ্য পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। তবে এ সময়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন দৃশ্যমান হয়েছে বলা যায়। এছাড়া,

১. GDP এর গড় প্রবৃদ্ধি ৭.৪% ধরা হলেও বড় সাফল্য লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ প্রবৃদ্ধি ছাড়িয়েছে সর্বকালের রেকর্ড।

২. দারিদ্র্যের হার ২৪.৮% হতে প্রায় ২০% এর নিকটে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১০% এর নিকটে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে ২০২০ এর মহামন্দা পুনরায় এক্ষেত্রে ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. ২০২০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা হবে ২৩০০০ মেগাওয়াট, যা চলমান প্রকল্পগুলো শেষ হলে এ লক্ষ্য অতিক্রম করবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

৪. মূল্যস্ফীতি ৬.৫% হতে ৫.৫% নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পরিকল্পনার সময়কালে নিয়ন্ত্রণে ছিল বলা যায়।

৫. জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যাসমূহ

Problems of Economic Planning in Bangladesh

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতিপয় বাস্তব সমস্যা রয়েছে। অধ্যাপক লুইস-এর মতে, উন্নত দেশ অপেক্ষা অনুন্নত দেশসমূহে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেমন অধিক আবশ্যক তেমনি এর বাস্তবায়ন করাও অধিক অসুবিধাজনক এবং পর্যাপ্ত সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. **পরিসংখ্যানের অভাব :** পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। সঠিক পরিসংখ্যান তথ্যের অভাবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

২. **অনভিজ্ঞ পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহকারী :** বাংলাদেশে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লোকের অভাব, খামখেয়ালিপনা ও জনসাধারণের অসহযোগিতার কারণে নির্ভুল পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা প্রায়ই সম্ভব হয় না।

৩. **পরিকল্পনা বিশারদের অভাব :** বাংলাদেশে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আধুনিক পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ বা পরিকল্পনা বিশারদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের এ সময়ে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে ভিনদেশি পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর সুপারিশ কতটুকু আমাদের দেশীয় স্বার্থ সুরক্ষা করবে, তার নিশ্চয়তাও নেই।

৪. **অদক্ষ প্রশাসন :** বাংলাদেশে দক্ষ কর্মচারীর অভাব, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি কারণে প্রশাসন বিভাগ অত্যন্ত দুর্বল এবং অদক্ষ হয়ে থাকে।

৫. **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশসমূহে মূলধনের একান্ত অভাব রয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত মূলধনের প্রয়োজন।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রার অভাব :** উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কারিগরি প্রযুক্তি, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি আমদানির জন্য যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, তা বাংলাদেশের হাতে নেই।

৭. **অদক্ষ শ্রমিক :** বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৮. **অতিরিক্ত জনসংখ্যা :** বাংলাদেশ জনসংখ্যাবহুল দেশ। জাতীয় আয়ের অধিকাংশই এ বর্ধিত জনসংখ্যার ভরণপোষণে ব্যয় হয়। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

৯. **জন-সহযোগিতার অভাব :** বাংলাদেশের জনগণ কম শিক্ষিত, উন্নয়নবিমুখ ও রক্ষণশীল। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা তারা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই অনেক সময় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জন-সহযোগিতা পাওয়া যায় না, বরং সহযোগিতা না পাওয়ার ফলে পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।

১০. **মিশ্র অর্থনীতির জটিলতা :** বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। এখানে সরকারি ও বেসরকারি খাত ভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সরকারি খাতের সম্পদ ব্যবহৃত হয় জনকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বেসরকারি খাতের সম্পদ প্রবাহিত হয় অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। জনগণের দুর্দশা লাঘবে বেসরকারি খাতের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রায়ই অকার্যকর হয়।

১১. **অবাস্তব ও উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা :** বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ পরিকল্পনা দেশের সম্পদ ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন। ক্ষুদ্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক পরিকল্পনাবিদ অনেক সময় পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও ভিনদেশি পরিকল্পনাবিদ উচ্চ মূল্যে নিয়োগ দিয়ে অযথা বৈদেশিক ঋণ হজম করতে বাধ্য করা হয়। শত বছরের পুরাতন রেল লাইন যেখানে সংস্কার হয় না সেখানে বুলেট রেল চালুর পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। এরূপ অনেক পরিকল্পনাই অর্থ অপচয় করে পরবর্তীতে বাতিল করা হয়।

১২. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল। ফলে উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পরিকল্পনা হলো স্বল্প সময়ের মধ্যে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র হাতিয়ার। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের সাফল্য নির্ভর করে বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, দক্ষ প্রশাসন, জনগণের উন্নয়নমুখী মনোভাব ও সহযোগিতার ওপর।

সারসংক্ষেপ

- কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করে সামাজিক সম্পদসমূহের যথোপযুক্ত বিলি-বণ্টন ও ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত সুনির্দিষ্ট সংস্থা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপকতম সমীক্ষা এবং উপযুক্ত চিন্তা ও বিবেচনার পর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণই হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।
- বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে তা হচ্ছে- পরিসংখ্যানের অভাব, অনভিজ্ঞ পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহকার, পরিকল্পনা বিশারদের অভাব, মূলধনের অভাব, মিশ্র অর্থনীতির জটিলতা, অবাস্তব ও উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা, অদক্ষ প্রশাসন ইত্যাদি।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কী?
২. অর্থনীতির ছুরিকার ধার বা প্রান্ত (Knife-edge) সমস্যা কী?
৩. অর্থনীতিবিদ রস্টোর তত্ত্বের উত্তরণ পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
৪. রস্টোর তত্ত্বের পরিপক্কতা অর্জন স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
৫. রস্টোর উন্নয়নস্তর তত্ত্বে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?
৬. উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
৭. নির্দেশভিত্তিক এবং প্ররোচিত পরিকল্পনা কাকে বলে?
৮. প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?
৯. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?
১০. স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য কী কী?
১১. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কী?
১২. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা এবং স্থির পরিকল্পনা কাকে বলে?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল নির্ধারকসমূহ আলোচনা করো।
৩. অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান অন্তরায়গুলো আলোচনা করো।
৪. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ আলোচনা করো।
৫. সমালোচনাসহ স্যুম্পিটারের উন্নয়ন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।
৬. সমালোচনাসহ রোজেনস্টেইন রোডান এর বৃহৎ ধাক্কা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।
৭. সমালোচনাসহ হ্যারড-ডোমার প্রবৃদ্ধি মডেলটি ব্যাখ্যা করো।
৮. সমালোচনাসহ রস্টোর উন্নয়ন স্তর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো। রস্টোর উন্নয়নস্তর তত্ত্বে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয় করো।
৯. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত শ্রম সংক্রান্ত লুইস মডেলটি ব্যাখ্যা করো।
১০. অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করো।
১১. উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করো।
১২. বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার সার-সংক্ষেপ আলোচনা করো।
১৩. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সমস্যাসমূহ আলোচনা করো।

Reference Books : Acknowledgements

1. N. Gregory Mankiw–Principles of Macroeconomics, 6th ed, CENGAGE learning
2. N. Gregory Mankiw–Principles of Macroeconomics, 6th ed, CENGAGE learning
3. J. F. Ragan, JR and L. B. Thomas JR,–Principles of Macroeconomics, HBJ Publishers
4. Mc Connell-Brue–Macroeconomics, 16/ed, McGraw Hill
5. P. A. Samuelson and W. D. Nordhaus–Economics, 17/ed, McGraw Hill
6. J M Henderson and R. E. Quandt–Microeconomic Theory, A Mathematical Approach, 3/ed, Mcgraw Hill
7. Eugene A Diulio–Macroeconomic Theory, 2.ed, McGraw Hill
8. D. N. dwivedi–Macroeconomics Theory and Policy
9. Dr. Sunil Bhaduri–Macroeconomics
10. A. P. Thirlwall–Growth and Development 6/ed, Macmillan Press Ltd.
11. Michael P. Todaro–Economic Development, 7/ed.
12. M. L. Jhingan–The Economics of Development and Planning 35/ed, Vrinda Publications (P) Ltd.
13. Internet : 'Primitive Communal System'/Economics
14. Marx, K. "Konspekt Knigi L. G. Morgana 'Drevnee Obshchestvo." In Arkhiv Marksa i Engel'sa, vol. 9. Moscow, 1941.
15. Engels, F. Anti Dühring. In K. Marx and F. Engels, Soch., 2nd ed., vol. 20.
16. Engels, F. Proiskhozhdenie sem i, chastnoi sobstvennosti i gosudarstva. Ibid, vol 21.
17. Lenin, V.I. "A. Bogdanov : Kratkii Kurs ekonomicheskoi nauki." (Review.) Poln. sobr. soch.,–Lenin, V.I. Gosudarstvo i revoliutsiia. Ibid; vol. 33 etc. 5th ed., vol-4.
18. খান রফিকুল ইসলাম– 'সামাজিক পরিবর্তন' গ্রন্থ কুটির, ১০১৪ এবং আসাদুজ্জামান, হাবিবুর, উজ্জল, লুৎফর– সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, কবির পাবলিকেশন্স, চতুর্থ প্রকাশ ২০১৯.
19. https://en.m.wikipedia.org/wiki/History-of-slavery
20. https://bn.m.wikipedia.org.wiki– দাসত্বের ইতিহাস-উইকিপিডিয়া
21. https://bn.m.wikipedia.org.wiki